শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

হুমায়ূন কবির

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

হুমায়ুন কবির

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৬৪
দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৬৬
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা, ১২
মুদ্রাকর—শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা, ৯
ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা, ১২
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.

নিবেদন

"শিক্ষক ও শিক্ষার্থী"র প্রথম সংস্করণ এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে ভাবিনি। শ্রীযুক্ত মনোজ বসুকে বলেছিলাম যে যদি দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হয় তবে আবার একবার লেখাগুলি দেখে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করবার চেষ্টা করব। বর্তমানে তা সম্ভব হল না। প্রায় ছয় মাস বইখানির ছাপা আটকে রেখেও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারলাম না। সেজন্য শ্রীযুক্ত বসু এবং অন্যান্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাই।

পূর্ব প্রতিশ্রুতির আংশিক পরিপূরক হিসাবে আগেকার লেখা শিক্ষা সম্বন্ধীয় আরো কয়েকটি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত হল। বর্তমান বইয়ের প্রথম রচনা প্রায় বাইশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ রচনাটি গত বছরের লেখা। কুড়ি বছরেরও বেশী শিক্ষা সম্বন্ধে যা ভেবেছি, যা বলেছি, যা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার একত্র সমাবেশে আজকের শিক্ষকের খানিকটা লাভ হতে পারে এই বিশ্বাসেই এ-সংকলন প্রকাশে রাজি হয়েছি। প্রবন্ধগুলি আর একবার পড়ে মনে হল যে মৌলিক বিষয়ে এ কুড়ি বছরে আমার মত বিশেষ বদলায় নি, অবশ্য মূলনীতির প্রয়োগ এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে ধারণার খানিকটা বদল না হলেই সেটা আশ্চর্যের বিষয় হত। পূর্বেও বহুবার বলেছি, আজও আবার বলতে চাই যে শিক্ষকের আদর্শবাদ, কার্যক্ষমতা এবং বিদ্যাবত্তাই সমস্ত শিক্ষাপ্রণালীর প্রাণ। আদর্শবাদী সুপণ্ডিত শিক্ষকের

সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য যাদের হয়, তাদের জীবনে এক নতুন আলো জ্বলে উঠে। যারা সে সৌভাগ্যের অধিকারী নয়, কেবলমাত্র শিক্ষার ধারা বদলে বা পাঠ্য বিষয়ক্রমের পরিবর্তনে তাদের বিশেষ কোন লাভ হয় না।

জ্ঞানের চেয়ে বড় শক্তি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই, এবং শিক্ষক বিদ্যা ও জ্ঞানের সেবক। তাই শিক্ষকের জীবনে দারিদ্র্য থাকতে পারে, অভাব-অনটন থাকতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে মর্যাদা ও গৌরব রয়েছে তাতে সমস্ত দৈন্য ও গ্লানি দূর হয়ে যায়। বাঙলা দেশের শিক্ষকের জীবনে সেই ঐতিহ্য দিন দিন আরো উজ্জ্বল হোক, এই কামনা করি।

কলিকাতা
৭ নভেম্বর ১৯৫৯ হুমায়ুন কবির

আতাউর রহমান
কল্যাণীয়েষু

ছাত্র ও সমাজ

আপনাদের কাছে বলেছি যে অতি অল্পদিন আমার ছাত্রজীবন শেষ হয়েছে। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে সে কথা যে কত বড় ভুল তা সহজেই ধরা পড়ে। সত্যি কথা বলতে গেলে আমার ছাত্রজাবন শেষ তো হয়ই নি, বরং এবারই যথার্থভাবে তার সুরু। আপনারা আজ ছাত্র—তার মানে এই যে স্কুল কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ালেখা আপনাদের কাজ, জ্ঞান অর্জ্জন আপনাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু জ্ঞান অর্জ্জন কি কোনদিন কারু জীবনে শেষ হয়—কখনো শেষ হতে পারে? স্কুল কলেজের শেষে সংসারে নেমে বহু মানুষের সঙ্গে বহুভাবে মিশে অভিজ্ঞতার দিন দিন বৃদ্ধি, জীবনের পাঠশালায় নতুন নতুন শিক্ষায় নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞানলাভ, এ সমস্তই কি ছাত্র জীবনের লক্ষণ নয়? ছাত্রজীবনে আদর্শের প্রতি যে আকর্ষণ, নিজের স্বার্থকে অবহেলা করবার যে প্রবৃত্তি যে শক্তি সাংসারিক জীবনেও কি তা সমান ভাবেই প্রয়োজনীয় নয়? সংসারে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে হলে যে, সহনশক্তি, অন্যের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি না হলে চলে না, স্কুল কলেজের জীবনেও সেই সহনশক্তি, সে দরদ, সে সহানুভূতি না হলে কি আমাদের চলে? তাই বেঁচে থাকলে ছাত্রজীবনের কোনদিন শেষ নাই—শেষ হতে পারে না। ছাত্রজীবনের, শেষ জীবনেরও সমাপ্তি।

একথা অনেক সময়ে আমাদের দেশে ভুলে যাই, এবং ভুলে যাই বলেই আমাদের জীবনে এত গ্লানি। আমরা ভাবি যে ছাত্রবয়সে

একভাবে জীবন কাটান যায়—সংসারে নেমে নতুন জীবন প্রণালীর দরকার। তাই ছাত্রজীবনের সঙ্গে সংসারের আমরা ভেদ সৃষ্টি করেছি। এ অন্যায় অস্বাভাবিক ভেদ সৃষ্টি করেছি বলেই আমাদের ছাত্রজীবন পঙ্গু, আমাদের সাংসারিক জীবন ব্যর্থ এবং হতাশা-তিক্ত। ছাত্রবয়সে সংসারের বিপুল জীবনধারাকে আমরা অস্বীকার করে বসে থাকি, সংসারে নেমে ছাত্রহৃদয়ের প্রবল আবেগ এবং নিঃস্বার্থপরতা আমাদের হৃদয়কে আর স্পর্শ করে না।

সংসারে নেমেও আমরা ছাত্র থাকি না বলে আমাদের জীবন সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার হয়ে ওঠে। ছাত্রজীবনের লক্ষণই এই যে নিজের স্বার্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ না থাকলেও নানা বিষয়ে আমরা আনন্দ পাই, তার জন্য পরিশ্রম করি। সাংসারিক জীবনে নেমেও আমরা সেই ভাবে সাক্ষাৎ স্বার্থ ভিন্ন অন্য ব্যাপার জানতে পরিশ্রম করি, তবে অভ্যাসের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আমরা কোনদিন বাঁধা পড়ব না, আমাদের জীবনের আনন্দভাণ্ডারও কোনদিন নিঃশেষ হবে না।

ছাত্রজীবনেও ঠিক তেমনি সংসারের সঙ্গে যোগ রেখে আমাদের চলতে হবে। যদি তা না করি, তবে পরবর্ত্তী জীবনে তার জন্য পদে পদে ভুগতে হবে। রাজনীতির কথাই ধরা যাক। অনেক সময়ে বলা হয় যে ছাত্রদের রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখা উচিত নয়, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে এ যোগ বিচ্ছিন্ন করা প্রায় অসম্ভব। আমরা সমাজে বাস করি। রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার প্রভাব সামাজের জীবনে প্রতি ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়, তাই সামাজিক জীবনে রাজনৈতিক প্রভাব এড়িয়ে চলা যায় না। সকালে খবরের কাগজ খুলেই তার পাতায় পাতায় রাজনৈতিক মতামত, রাজনৈতিক বিধি-নির্দ্দেশের ছড়াছড়ি,

কিন্তু তাই বলে কেউ কি বলতে পারেন যে ছাত্রজীবনে খবরের কাগজ পড়া উচিত নয়? এক সময়ে আমাদের নেতাদের বোধ হয় তাই মত ছিল কিন্তু পরে সে মত একেবারে উলটে যায়। অনেকেই বলেন যে ছাত্রদের রাজনীতির সঙ্গে সম্বন্ধ ত রাখতেই হবে, বরং রাজনীতির ক্ষেত্রে কাজ করবার ভার অনেকখানি তাদেরই। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে এ মতই প্রবল হয়ে উঠেছিলো, কিন্তু তার ফলে দেশের ছাত্রজীবনে যে বিপর্য্যয় ঘটে, তা দেখে অনেকে আজ বলেন যে ছাত্রদের রাজনৈতিক খবরাখবর রাখা উচিত, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তারা যেন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ না দেয়। আজকাল বেশীর ভাগ নেতারই মত বোধ হয় এই।

এ সম্বন্ধে কিন্তু দুটী ভাববার বিষয় আছে। প্রথমতঃ রাজনৈতিক খবরাখবর রাখলেই কর্ম্মক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করার ইচ্ছা স্বাভাবিক বিশেষ করে মতবাদ এবং তার প্রয়োগ, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের রেখা সব ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। প্রয়োগেই মতবাদের সার্থকতা, এবং রাজনীতির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে আমাদের শিক্ষাকে যেমন সম্পূর্ণ বলা চলে না, ঠিক তেমনি ব্যবহারবিচ্ছিন্ন মতবাদকে মতবাদ বলে স্বীকার করা কঠিন। সমাজে বাস করতে হলে রাজনীতি নিয়ে খানিকটা নাড়াচড়া তাই অনিবার্য্য এবং শিক্ষার দিক থেকেও ছাত্রেরা রাজনীতিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে পারে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে অভিজ্ঞতা ভিন্ন কোন কাজই ভাল করে করা যায় না। প্রথমবারে সকলেরই ভুলচুক হয় এবং বার বার চেষ্টার ফলে সেই ভুলগুলি ক্রমে শোধরায়। ভুলগুলি মারাত্মক হলে শোধরাবার আর সময় মেলে না। তরুণ বয়সে ছাত্রজীবনে আমরা রাজনীতি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করি বলে যখন রাজনীতির ক্ষেত্রে

আমরা নামি, তখন পরিণত বয়সেও আমরা অনভিজ্ঞ ছাত্রের মতনই ভুলচুক করে বসি। ছাত্রজীবনে ভুলচুক করলেও বিশেষ কিছু আসে না, কারণ আমাদের ক্ষমতা অল্প, আমাদের দায়িত্ব সঙ্কীর্ণ, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে সে রকম ভুল করে বসলে তার ফল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সে কথা বলা কঠিন। তাই ছাত্রবয়সে খানিকটা রাজনীতির অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা দেশের মঙ্গলের দিক দিয়ে আমাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনেক দেশে ছাত্রদের নিজেদের রাজনীতির একটা ক্ষেত্র আছে। দেশের এবং পৃথিবীর রাজনীতির সঙ্গে সে রাজনীতির যোগ রয়েছে, কিন্তু সে সংযোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়। তাই নিজেদের রাজনীতির ক্ষেত্রে ছাত্রেরা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে, অথচ সে অভিজ্ঞতা কিনতে তাদের জীবন পণ করতে হয় না। ছাত্রদের এ রকম নিজস্ব ক্ষেত্রের আরও একটা লাভ আছে। সেখানে তারা স্বাধীন, সেখানে সমস্ত কাজের দায়িত্ব তাদের, তাই তাদের উৎসাহ এবং উদ্যম, তাদের প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য সেই ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করে। শৃঙ্খলাই স্বাধীনতার ভিত্তি, তাই সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাদের মনে শৃঙ্খলা এবং সংহতিবোধ বদ্ধমূল হয়ে যায়। আমাদের দেশের ছাত্রদের বিরুদ্ধে যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং শৈথিল্যের অভিযোগ শোনা যায়, তার আসল কারণ এইখানেই মেলে। নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্র নেই বলে তারা শৃঙ্খলা এবং সংহতির মূল্য বুঝতে শেখে না, তাদের প্রবল প্রাণধারা দেশের বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করে।

রাজনীতির সঙ্গে তাই ছাত্রজীবনের কোন বিরোধ নেই, কিন্তু আমাদের দেশে যে ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা, তার ফলে সে সম্বন্ধ

সময়ে বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। ছাত্রের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ এবং লাভের গোড়ার কথা ঔৎসুক্য এবং অনুসন্ধিৎসা। সমস্ত জিনিষেরই অর্থ খোঁজা ছাত্রের ধর্ম্ম এবং এই জিজ্ঞাসাই জ্ঞানের ভিত্তি। জিজ্ঞাসা, সন্দেহ, সমালোচনা, এ সব জিনিষ কিন্তু আমাদের দেশে আদর পায় না। আমাদের শিক্ষারীতির মূল কথা কর্ত্তৃত্ব এবং স্বীকৃতি। শিক্ষক যা বলেন, ছাত্র বিনাবাক্যে বিনাবিচারে তাই গ্রহণ করবে, এই আমাদের শিক্ষার ধারা। অন্যান্য দেশে কিন্তু বিতর্ক, বিচার এবং স্বাধীন চিন্তাই শিক্ষার মূল কথা। শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে যুক্তিতর্কের ফলেই ছাত্র নিজের চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। নিশ্চেষ্ট গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের শিক্ষাকে ব্যর্থ করে দেয়, তাই দেখা যায় যে আমাদের দেশে অক্ষরজ্ঞানীদের মধ্যেও অশিক্ষিতের অভাব নেই।

আপনারা ছাত্র, আমিও নিজেকে ছাত্র মনে করি, তাই আমাদের পরস্পর আলোচনার মধ্যে আত্মপ্রশংসা বা আত্মবঞ্চনার কোন দরকার নেই, বরং সে আত্মবঞ্চনায় সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। আমরা যদি সত্য সত্যই দেশের এবং সমাজের মঙ্গল চাই, তবে এ আত্মবঞ্চনা ভুলে আমাদের দোষ কোথায় সে কথা অকপটে স্বীকার করতে হবে। যারা আমাদের চেয়ে বয়সে বড়, তারা যে অভিজ্ঞতাতেও আমাদের চেয়ে বড়, সে কথা স্বীকার করতে আমাদের কোন লজ্জা নেই। ছাত্রজীবনের উৎসাহ, ছাত্র জীবনের আদর্শবাদ কেবল মাত্র ছাত্রদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়! প্রবীন বয়সেও অনেকেই নতুন মতবাদ প্রচার অথবা নতুন মতবাদ গ্রহণের শক্তি দেখিয়েছেন। যৌবন যে মনের ধর্ম্ম, বয়সের নয়, এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে?

আমাদের মধ্যে কি সে যৌবন, সে জিজ্ঞাসা মেলে? সমাজ,

শাসনতন্ত্র, শিক্ষা, ধর্ম্ম এবং অধিকারের কথা কি আমরা যৌবনের চোখ দিয়ে দেখি? বর্ত্তমানে আমাদের পৃথিবী যে অনিবার্য্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে, চোখের সামনে সমাজের সংগঠন ভেঙ্গে পড়ছে, সে বিষয়ে আমরা কি বাস্তবিক ভাবি? আমাদের দেশে প্রতি দশজন লোকের মধ্যে নয়জন যে ব্যবস্থার ফলে নিরক্ষর, সে ব্যবস্থার অন্যায় কি আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে? বিলেতে গড় পড়তায় প্রত্যেক লোক চুয়ান্ন বছর বাঁচে, কিন্তু আমাদের দেশে চব্বিশ বৎসরেই জীবনের ভরসা ফুরিয়ে আসে, এ অবস্থার বিভীষিকা কি আমরা সকল সময়ে মনে রাখি? আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, কিন্তু হাজার লোক পিছু আশী টাকাও যে এ দেশে কৃষির উন্নতির জন্য খরচ হয় না, সে কথা কি আমরা জানি? আমেরিকা এবং বিলেত কৃষিপ্রধান নয়, কিন্তু সেখানেও যে কৃষির উৎকর্ষে প্রতি হাজার লোকের জন্য বছরে হাজার টাকা খরচ হয়, তা দেখেও কি আমরা শিখব না?

আমাদের সমাজ সংগঠনের দিকে তাকালে যে অন্যায় যে বৈষম্য চোখে পড়ে, সে সম্বন্ধে কি আমাদের মনে বিদ্রোহ জাগে? বাংলায় চাষী রক্ত জল করে যে ফসল তোলে, তার মধ্যে তার ভাগ কতটুকু? জমিদারের খাজনা জোগাবার পর চাষীর ভাগে অতি অল্পই থাকে, কিন্তু মহাজনের সুদে তাও মিলিয়ে যায়। একজনের প্রাণান্ত পরিশ্রমে আরেক জনের বিলাসিতা, এ অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য আমরা কি ভাবি? পরগাছার সমাজে স্থান নেই, কিন্তু সেই পরগাছা দূর করার উপায় যে কি, সে সম্বন্ধে আমরা যদি সচেতন না হই তবে কে হবে? সমস্ত পৃথিবী ভরেই এ প্রশ্ন উঠেছে। যারা অন্যের পরিশ্রমে নিজেদের মুনাফা

সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত, তাদের সমাজে কি ভাবে কাজে লাগান যায়, এ সমস্যার সমাধান সকলেই আজ চায়। বাজারে এখন যে মন্দা, সমস্ত জিনিষ পত্রের দাম যে ভারে পড়ে গিয়েছে, সে সম্বন্ধে অর্থনৈতিকেরা আজ বলছেন যে বর্ত্তমানের ধনতান্ত্রিক সমাজে তা হবেই। একবার দর চড়বে, আর একবার পড়বে। ওঠাপড়ার মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদীর সমাজ চলে, কিন্তু ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের ফলে দিন দিন ওঠার চেয়ে পড়াটাই বেশী স্পষ্ট এবং স্থায়ী হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ছুনিয়ায় হাজার হাজার লোকের খোরাক জোটে না, অথচ লক্ষ লক্ষ মণ গম পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, পাছে গমের দাম কমে যায়। হাজার হাজার লোক অন্নহীন এবং বিবস্ত্র, কিন্তু তবু লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে বসে আছে, কল চলে না, কারখানা বন্ধ। মানুষের অভাবের অন্ত নেই, কিন্তু তবুও অভাবের পূরণ হয় না। তাই ধনিকের মুনাফা বাড়াতে গেলে ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে হয়, ক্ষুধিতের ক্ষুধার অন্ন জোটাতে হলে ধনিকের মুনাফা থাকে না। এক কথায় ধনতন্ত্রবাদের ভাঙন আজ স্পষ্ট। ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের হিসাবের বদলে সমাজের সম্মিলিত কল্যাণের দিক দিয়ে না তাকালে আমাদের রক্ষা নেই।

এ সব কথায় আমাদের দেশে অনেকেই ভয় পায়। ভাবে যে একবার নিয়ন্ত্রণের কথা উঠলেই আর সমাজতন্ত্রবাদ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এবং তাদের চোখে সমাজতন্ত্রবাদ বিভীষিকা। অথচ নিজের স্বার্থের ক্ষেত্রে তারাই নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যস্ত। কলওয়ালা চায় যে তার মজুরেরা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে যে কোনদিন যেন তারা

অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা মনে না আনে। জমিদার চায় যে প্রজা এমন ভাবে শৃঙ্খলিত থাক যে কোনদিন যেন তারা বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি না করে। শিক্ষা এবং সমাজগঠন, জনমত এবং অর্জ্জন-উপায়—এ সমস্তই আজ এমনভাবে তৈরী যে বর্ত্তমানের ধনতান্ত্রিক সমাজের সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধিই তাদের উদ্দেশ্য। কাজেই তাদের আপত্তি নিয়ন্ত্রণে নয়—তাদের আপত্তি এমন নিয়ন্ত্রণে যায় ফলে ব্যক্তিস্বার্থের বদলে সামাজিক স্বার্থকেই বড় করে দেখা হয়।

আজকাল প্রায়ই বেকার সমস্যার কথা শোনা যায়, তবে বেকার সমস্যা বলতে আমরা সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমস্যার কথাই ভাবি। আমাদের চোখে অশিক্ষিত বঞ্চিত চাষী মজুর তো আর মানুষ নয় যে তাদের সমস্যার কথাও আমাদের ভাবতে হবে! অথচ বেকার সমস্যাকে এ রকম করে বিচ্ছিন্ন করে দেখা কেবলমাত্র নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়, কারণ বিভিন্ন প্রকারের বেকারসমস্যা এই রোগের লক্ষণ। সমাজের যারা অঙ্গ, তারা সমাজ-প্রক্রিয়ায় স্থান পাচ্ছে না—বেকারসমস্যার এই মূলকথা, এবং সে কথা শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণী সকলের বেলায়ই খাটে। তাই কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের বেকার সমস্যায় ঝোঁক দিয়ে আমরা নিজেদের স্বার্থপরতা এবং সংকীর্ণতাই প্রকাশ করি।

এ কথা স্পষ্ট যে সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে না নিলে বেকারসমস্যা সমাধানের কোন কথাই উঠতে পারে না। বর্ত্তমান পৃথিবীতে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, রাজনীতির যে নৈরাজ্য সে কথার আলোচনা আগেই করেছি, কারণ অরাজকতা না হলে একই জিনিষ বেচবার জন্য পরস্পরের মধ্যে যে মারাত্মক প্রতিযোগিতা, তা কখনো সম্ভব হত না! প্রয়োজনীয় জিনিষ আমাদের জোটে না, অথচ

বিলাসিতার যে সমস্ত সামগ্রী, তার আমদানী দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই এ ব্যক্তিতান্ত্রিক নৈরাজ্য জীবিকার ক্ষেত্রেও স্বীকার করে নিলে বলা উচিত যে কার ভাগ্যে কাজ জুটল এবং কে বেকার রইল, সে সমস্যা ব্যক্তির সমস্যা, সমাজের বা শাসনতন্ত্রের তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। সে কথা কিন্তু কখনো বলা হয় না—কেউ বলতে সাহস পায় না যে ব্যক্তির জীবনের সার্থকতা বা অসার্থকতার ব্যাপারে সমাজের দায়িত্ব নেই। তাই বেকার সমস্যা নিয়ে আমরা ভাবি, নানা উপায় উদ্ভাবন করে সমাজের সমস্ত লোকের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় নির্দ্ধারণ করতে চাই। এই স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সমাজনিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়, এবং একবার যদি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিই, তবে সে নিয়ন্ত্রণ সমাজের প্রত্যেক স্তরকেই স্পর্শ করতে বাধ্য। সমাজনিয়ন্ত্রণের কথায় তাই ভয় পাবার কোন কারণ নেই—বর্ত্তমানের এ পাগলা পৃথিবীতেও নিয়ন্ত্রণের পরিচয় মেলে। আমরা কেবল চাই যে সজাগ এবং সজ্ঞান পরিকল্পনার দ্বারা আমরা সে নিয়ন্ত্রণকে সার্থক ও সর্ব্বতোমুখী করব।

একটী উদাহরণ দিলেই এ কথা পরিষ্কার হয়ে ধরা দেবে। আজকালকার পৃথিবীতেই এমন লোক আছে যে মুহূর্ত্তের সখ মেটাতে লক্ষ টাকা খরচেও তার বাধে না। অন্য পক্ষে আবার লক্ষ লক্ষ এমন লোক আছে যে সমস্ত বৎসরের মধ্যে একদিনও তাদের ভরাপেট খোরাক জোটে না। একদিকে অভাবের বিপুল তাড়না, অন্যদিকে বেকার সমস্যার তীব্র হতাশা। নিয়ন্ত্রিত সমাজে কিন্তু এ বিসদৃশ বৈষম্য সম্ভবপর নয়, ব্যক্তির চেয়ে সমাজের কল্যাণ সে সমাজের চোখে বেশী মূল্যবান। আমাদের দেশে সরকারী এবং অর্দ্ধসরকারী হিসাবেও প্রায় সাত কোটী লোক চিরদিনের মত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত, এবং

আরো প্রায় ১৪ কোটী লোক অর্দ্ধাহারী, অথচ এই একুশ কোটী লোক যদি রোজ একমুটো করেও বেশী ভাত খায়, তবে হাজার হাজার মন ধানের চাহিদা বেড়ে যাবে, হাজার হাজার লোকের তাতে কাজ জুটবে। এই একুশ কোটী লোকের মধ্যে অধিকাংশই বিবস্ত্র বা অর্দ্ধনগ্ন—তারা যদি প্রত্যেকে বছরে চার হাত করেও বেশী কাপড় পরে, তবে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নয়, দেশবিদেশের কলকারখানা সে দাবী কুলিয়ে উঠতে পারবে না। অনাহারে অর্দ্ধাহারে এবং অসুখ বিসুখে যে লক্ষ লক্ষ শিশু প্রসূতি এবং নরনারী বছর বছর মৃত্যু বরণ করে, তাদের অনেক ক্ষেত্রেই বাঁচানো যায় এবং তাদের বাঁচতে চাইলে প্রতি শহরে প্রতি গ্রামে চাই ডাক্তার, চাই ওষুধ চাই ধাত্রী—হাজার হাজার লোকের তাতে কাজ জুটবে কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত সমাজে সে সব কে করে? নিয়ন্ত্রিত সমাজে তাই বেকারের স্থান নেই—বেকার সমস্যা বলে কোনো সমস্যাও সেখানে ওঠে না।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে আমি বেশী কথা বলতে চাইনে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা যে ভাবে আজ আমাদের দেখতে শেখানো হচ্ছে তা কি বস্তুতপক্ষে ঠিক? আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা মানুষের নিম্নতম অধিকারের সমস্যা। স্বাধীনতার দাবী যেখানে মেটেনা, খিদের অন্ন যেখানে জোটে না, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে পদে পদে অপমানিত হয়, সেখানে কি সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে সব চেয়ে বড় করে দেখা যুক্তিসঙ্গত? আমাদের প্রকৃত আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট করবার জন্যই এ সমস্যাকে আজ এত বড় করে সাজানো হচ্ছে। যদি আমরা সে কৃত্রিম আন্দোলনে ভুলি, তবে স্বাধীনতার সংগ্রামের আসল কথা চাপা পড়ে যাবে।

আরো একটী কথা সে বিষয়ে আমি বলব। 'সাম্প্রদায়িক' কথাটী আজ গালির মধ্যে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য যে নিজের স্বার্থ বর্জ্জন করতে পারে, সে তো সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র, কারণ সমাজের মঙ্গলই তার কাছে বড় কথা। সকল দেশেই আমরা সে রকম লোক চাই। সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথাই এই যে ব্যক্তিকে বড় না করে সমাজকে সম্প্রদায়কে বড় করে দেখতে হবে। যে লোক এই প্রকৃত অর্থে সাম্প্রদায়িক হতে চায়, সেই দেখবে যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায় হিসাবে কোন স্বার্থের বিরোধ নেই, স্বার্থের বিরোধ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির। এক সম্প্রদায়ের ভালো চাইতে হলে সমস্ত সম্প্রদায়ের মঙ্গল না চেয়ে উপায় নেই। কারণ খাওয়া, পরা, স্বাস্থ্য সুবিধায় আমাদের দেশে সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের স্বার্থ এমনভাবে জড়িত যে একটীকে বাদ দিয়ে আর একটি সম্বন্ধে কিছু করা অসম্ভব।

আজকাল যারা এ সমস্ত তথাকথিত সাম্প্রদায়িক আন্দোলন চালায়, তারা তাই প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িকও নয়—তারা স্বার্থপর, তারা লোভী, তারা সম্প্রদায়ের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেদের অভিসন্ধি পূর্ণ করতে চায়। তাদের সাম্প্রদায়িক বলাও ভাষার অপপ্রয়োগ—তাদের বলতে হবে সম্প্রদায়ের শত্রু, দেশের শত্রু, মানুষের শত্রু।

শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি—সমাজের গলদ এবং দোষ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করা। তাই ছাত্রদের মধ্যে আজ এ সমস্ত ব্যাপারে যদি স্বাধীন চিন্তা না থাকে, তবে ছাত্র হিসাবেও আমরা ব্যর্থ, দেশের ভবিষ্যতও অন্ধকার। কিন্তু আমরা যদি আজও এ সব বিষয় ভাবতে সুরু করি, কোন জিনিষই বিনা প্রশ্নে, বিনা বিচারে অন্ধের মত স্বীকার করে না নিই, তবে আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু,

দেশের এ দুর্দ্দশা ঘুচবেই। তাই আলো চাই, শিক্ষা চাই, এবং আরো আলো চাই, আরো শিক্ষা দেশের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক; ছাত্র, হিসাবে এই আমাদের একমাত্র কামনা।

বর্ধমান ছাত্র সম্মেলন, আশ্বিন ১৩৩৩

বুদ্ধির সাধনা

আজ এ ছাত্রসম্মেলনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই এই কথা মনে পড়ে যে দেশের দিকে দিকে আজ যৌবনের যে জাগরণের সাড়া, তার অর্থ কি? কিসের জন্য আজ সামগ্র দেশের ছাত্রসমাজ চঞ্চল উদ্‌গ্রীব? জেলায় জেলায় প্রদেশে প্রদেশে ছাত্রসম্মেলনে যে দাবী ধ্বনিত হচ্ছে, তার সার্থকতা কোথায়?

রাজনীতির সঙ্গে ছাত্রজীবনের সম্বন্ধ নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাইনে। কারণ দেশের ছাত্রসমাজ প্রায় বিনাদ্বিমতে স্বীকার করে নিয়েছে যে রাজনৈতিক জীবনে যোগদান না করে আজ আর উপায় নেই। তার কারণ স্পষ্ট। যে সমস্ত সমস্যাকে আমরা বিশেষ ভাবে ছাত্রসমস্যা বলে ভাবি তাদের সমাধানের জন্যও ছাত্র জীবনের জন্যও ছাত্রজীবনের সীমানা অতিক্রম করে রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও সমাজ-ব্যবস্থার বিবেচনা না করে উপায় নেই। সমাজে আমাদের বাস, রাষ্ট্র সমাজসংগঠনের রাজনৈতিক রূপ। তাই সমাজকে বর্জ্জন না করলে রাজনীতিকে এড়ানোও অসম্ভব। প্রতিপদে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় রাষ্ট্রের শাসন অনুশাসন আমাদের জীবনকে সহস্র ভাবে স্পর্শ করে।

ছাত্রজীবনেও তাই রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করা চলেনা—প্রতিপদে পৃথিবী আমাদের ছাত্রজীবনের স্বপ্নবিলাসকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। পৃথিবীর সঙ্গে যদি আমরা যোগ রাখতে চাই, দুনিয়ার হালচালের খবর নেবার যদি আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকে, তবে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে রাজনীতির সহস্র চক্রাবর্ত্ত আমাদের আঘাত

করবেই। খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক মাসিকের পাতার পরে পাতা রাজনৈতিক খবরাখবরে ভর্ত্তি—তাই বলে কি আমরা খবরের কাগজ, মাসিক, সাপ্তাহিক পড়াই ছেড়ে দেব ?

রাজনীতিকে তাই ছাত্রজীবনে স্বীকার করে নিতে হবে, কিন্তু এই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে যে ছাত্রজীবনের বিশেষ পরিবেষ্টনের মধ্যে রাজনীতিকে কি ভাবে কার্য্যকরী করা উচিত? দেশের জনসাধারণের যে রাজনৈতিক আন্দোলন—তার মধ্যে আবেগ ও যুক্তি দুইয়েরই প্রেরণা আছে, তবে আবেগের প্রাবল্যে যুক্তি বহুক্ষেত্রেই নিষ্প্রভ। ছাত্রজীবনেও কি আমরা সেই ভাববিলাস, সেই আবেগবহুল প্লাবনের প্রকাশ দেখতে চাই। যৌবনে প্রাণধর্ম্ম প্রবল, তাই কেবলমাত্র সেই প্রবলতার মধ্যেই কি ছাত্র হিসাবে আমরা আত্মসমর্পণ করব ?

ছাত্রজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জ্জন এবং সত্যের সাধনাই জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র পথ। ঔৎসুক্য এবং অনুসন্ধিৎসা ভিন্ন সত্যবিচার অসম্ভব। কিন্তু কেবলমাত্র ঔৎসুক্য এবং অনুসন্ধিৎসা দিয়াও সত্যকে পাওয়া যায় না। সেজন্য চাই সবল বুদ্ধিবৃত্তি, সেজন্য চাই সতেজ বিচারশক্তি। বুদ্ধির মুক্তি, বুদ্ধির স্বাধীনতা তাই জ্ঞানার্জ্জনের গোড়ার কথা। এবং সেজন্য আমার মনে হয়, বুদ্ধির স্বাধীনতার সাধনাই ছাত্রজীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা। সমস্ত জিনিষেরই অর্থ খোঁজা ছাত্রের ধর্ম্ম, এবং এই সজাগ জিজ্ঞাসাই তার সত্যিকার লক্ষ্য। সন্দেহ, সমালোচনা, জিজ্ঞাসা, এ সব জিনিষের কিন্তু আমাদের দেশে আদর নেই—আমরা ভাবি যে জিজ্ঞাসার অর্থই বিদ্রোহ, সমালোচনার অর্থই অবমাননা। কর্ত্তৃত্ব এবং স্বীকৃতির উপর আমাদের শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত, তাই শিক্ষক যা বলেন, বিনাবাক্যে, বিনাবিচারে, বিনা জিজ্ঞাসায় তা মেনে নেওয়াই আমাদের দেশে ছাত্রের কর্ত্তব্য। অন্যান্য

দেশে কিন্তু বিতর্ককে অপমান মনে করা হয় না, তাই বিচার ও স্বাধীনচিন্তার বিকাশই সেখানে শিক্ষার এবং ছাত্রের মধ্যে স্বাধীনচিন্তার আদানপ্রদানে সে সমস্ত দেশে ছাত্রের নিজের চিন্তাধারাই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

পরাধীন দেশে এ শিক্ষাব্যবস্থায় আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। কারণ বলিষ্ঠ স্বাধীন চিত্ত এবং রাজনৈতিক বা সামাজিক পরাধীনতা পরস্পরবিরোধী। তাই আপনাদের এ সম্মেলনে আমি দেশের ভবিষ্যৎ আশার আভাস খুঁজি। দেখতে চাই যে আপনাদের এ সম্মেলনে বুদ্ধির মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে আপনারা দেশের বহুমুখীন বহু সমস্যাকে উপলব্ধি করে তাদের সমাধান খুঁজছেন। যৌবনের ধর্ম্ম প্রাণবাহুল্য—আবেগের প্রবলতা; কিন্তু অন্ধ আবেগের প্রবাহ আমাদের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করতে পারে না। তার মধ্যে শক্তি আছে কিন্তু লক্ষ্য নেই, গতি আছে কিন্তু কোন দিক-নির্দ্দেশ নেই। তাই আমার একান্ত কামনা যে আপনাদের যৌবনের প্রাণ-প্রাচুর্য্যের সঙ্গে মিলুক বুদ্ধির মুক্ত দৃষ্টি, আবেগের অন্ধ প্রবলতার মধ্যে আসুক স্বাধীন-চিন্তার স্পষ্ট দিবালোক।

বাংলা দেশে আজ যে ছাত্রসম্মেলনের পরে ছাত্রসম্মেলন, তার মধ্যে আমি বুদ্ধির এই বিজয়াভিযানের ইসারা খুঁজে বেড়াই। দেখতে চাই যে বাংলার বিক্ষুব্ধ নবজাগ্রত যৌবন আজ কোনো কিছুই অন্ধভাবে মেনে নিচ্ছেনা—বারে বারে তার কণ্ঠে এক প্রশ্ন, বারে বারে তার একই জিজ্ঞাসা—মুক্তির পথ কোথায়? আমাদের মনের সে যৌবন আজ জেগেছে, তারই আলোড়নে বাংলার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে এ ছাত্র আন্দোলন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, আমাদের বুদ্ধির বিজয়-অভিযান কি জীবনের সমগ্র দিককে আজও স্পর্শ করেছে?

সমাজ, শাসনতন্ত্র, শিক্ষা, ধর্ম্ম এবং মানুষের বিভিন্ন অধিকারের কথা কি আমরা যৌবনের উদার নির্ম্মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখি? রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের কাম্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য মানুষের সঙ্গে মানুষের সাম্যকে অস্বীকার করে কি স্বাধীনতার সৌধ গড়া যায়? জাতিভেদ আজও যে সমাজব্যবস্থার অঙ্গ, পর্দ্দা প্রথার আজও যে দেশে প্রচলন, সে দেশের যৌবনকে কি আমরা পূর্ণভাবে জাগ্রত বলতে পারি?

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে আজ সাম্প্রদায়িক সমস্যা দিন দিন উগ্রতর হয়ে উঠ্ছে—কিন্তু রাজনৈতিক এবং সামাজিক বুদ্ধিহীনতার এত বড় নিদর্শন কি অন্য কোন দেশে আছে? আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা মানুষের নিম্নতম অধিকারের সমস্যা। স্বাধীনতার দাবী সেখানে মেটে না, ক্ষুধায় যে দেশে অন্ন জোটেনা, মানুষের মনুষ্যত্ব সেখানে পদে পদে অপমানিত, সে দেশে কি সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে সবচেয়ে বড় করে দেখা যুক্তিসঙ্গত? বুদ্ধির মুক্ত আলোকে যদি আমরা এ সমস্যার বিচার করি, তবে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে আমাদের স্বাধীনতার আদর্শকে চাপা দেওয়ার জন্যই আজ এ সমস্যাকে এত বড় করে সাজানো হচ্ছে। রাজনৈতিকেরাও স্বীকার করেন যে হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ এক। তাঁরা স্বীকার করেন যে সমস্ত সম্প্রদায়ের যুক্ত প্রচেষ্টা ভিন্ন দেশের স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব, তাঁরা স্বীকার করেন যে যুক্ত প্রয়াস ভিন্ন আমাদের অর্থনৈতিক দৈন্য কোনদিন ঘুচবে না। সমস্ত স্বীকৃতির পরেও প্রকাণ্ড একটা "কিন্তু" থেকে যায়—সেই "কিন্তুই" আজ আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির বৃহত্তম প্রতিবন্ধক।

সেই প্রতিবন্ধক দূর করবার জন্য আজ ছাত্রসমাজ কি বুদ্ধির

মুক্ত দৃষ্টিতে সমস্যার সমাধান খোঁজে? বলিষ্ঠ মনের সতেজ জিজ্ঞাসার সম্মুখে এ সাম্প্রদায়িক বিরোধের যৌক্তিকতা কতটুকু? মিথ্যা অভিমান, মিথ্যা দর্প, মিথ্যা স্বাদেশিকতার মোহকে অতিক্রম করে আমরা কি আজ কল্যাণের পথের সাধক? পৃথিবীর দেশে দেশে আজ জাতীয়তার অগ্নিপরীক্ষার দিন। আমরা কি সেই পরীক্ষার ভয়ে পিছিয়ে যাব? সমস্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও দ্বন্দ্বের মূলে স্বার্থসংঘাত। যুদ্ধমান সমাজ পরস্পরের দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারেনি, সাম্প্রদায়িকতার এই মূলকথা। কিন্তু সামঞ্জস্যসাধন জীবনের ধর্ম্ম— তাই যারা পরস্পরের মধ্যে সন্ধি করতে শেখে নাই, তাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। বিভিন্ন দলের সমষ্টিতে যে সমগ্র সমাজ, তার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিভিন্ন দলের স্বার্থসমন্বয় অপরিহার্য্য। সেই সমন্বয়-সাধনের জন্য যে মুক্ত দৃষ্টির প্রয়োজন, তার সাধনা কি আমাদের মধ্যে আছে?

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে আর একটা কথা শুধু বলতে চাই। সে সমস্যা সমগ্র সমাজের সমস্যা নয়—সে সমস্যা বিশেষভাবে শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে জড়িত। দেশের বিপুল জনসাধারণের মধ্যে অভাবের অন্ত নেই। সে অভাবের কোন সাম্প্রদায়িক রূপ নেই, তাই সে অভাব দূর করার যে ব্যবস্থা, তার মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার অবকাশ নেই। এক সম্প্রদায়ের ভাল চাইতে হলে সমস্ত সম্প্রদায়েরই মঙ্গল না চেয়ে উপায় নেই। কারণ খাওয়া-পরা, স্বাস্থ্য সুবিধায় আমাদের দেশে সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের স্বার্থ এমন ভাবে জড়িত যে একটীকে বাদ দিয়ে অন্যটীর সম্বন্ধে কিছু করা অসম্ভব। কৃষক প্রজার যে ডালভাতের দাবী, সে দাবী মুসলান হিন্দু নির্ব্বিশেষে সকলের দাবী। পাটের দর যদি বেঁধে দেওয়া হয়, তবে তার ফল উপভোগ হিন্দু মুসলমান সমানভাবেই করবে—তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক

কলহ বা সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারার কথা ওঠে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেলা কিন্তু সেই স্বার্থসংঘাতই প্রবলভাবে দেখা দেয়, কারণ সমাজব্যবস্থার পুরস্কার ও লাভের উপরই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিত্তি। সেখানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কাড়াকাড়ি অনিবার্য্য। যেটুকু লাভ মধ্যবিত্ত হিন্দুর ভাগে জুটল, মধ্যবিত্ত মুসলমান ঠিক ততখানি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল। আজ হিন্দুর সেই লাভের ভাগে মুসলমান দাবী জানাচ্ছে বলেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার এ তীব্র রূপ।

দেশের বিপুল জনসাধারণের জীবনে তাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতিঘাত গভীর নয়, কিন্তু তাই বলে সে সমস্যাকে অগ্রাহ্যও করা চলে না। কারণ সমস্ত দেশেরই রীতি এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী জনসাধারণকে চালনা করে। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থকেই জনসাধারণ আপনার স্বার্থ বলে ভাবে। তাই সাম্প্রদায়িক সংঘাত জনসাধারণের স্বার্থ-বিরোধী হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বের ফলে জনসাধারণের মনে সে সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে। তার এক মাত্র প্রতিকার জনসাধারণকে আপনার স্বার্থ সম্বন্ধে জাগ্রত করে তোলা, এবং এ জাগরণের কাজ বহুল পরিমাণে মধ্যবিত্তশ্রেণীরই লোকের কাজ।

ছাত্রসম্মেলনে তাই আজ আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে এ সমস্ত সমস্যার সম্বন্ধে আপনাদের মনে কি সন্দেহ জেগেছে? আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা আবেগ ও ভাববিলাস—সেই দুর্ব্বলতাকে জয় করে আমরা কি দেশের সমস্ত সমস্যার মূলসূত্র সন্ধানের সাধনা সুরু করেছি? দারিদ্র্যের প্রশ্ন, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন, এ সমস্তই মূলত রাজনীতির প্রশ্ন, তাই আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে রাজনীতির এ ব্যাপক রূপ সম্বন্ধে আপনারা কি ভাবতে সুরু করেছেন?

আজকার যুগ গণতন্ত্রের যুগ এবং সে সম্বন্ধে আমাদের প্রথম শিক্ষা

এই যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অসম্ভব। তাই স্বাধীনতার পূর্ণ প্রকাশের জন্য আজ আমাদের কর্ত্তব্য রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে নতুন পরিকল্পনায় নতুন সমাজনিয়ন্ত্রণ। অনিয়ন্ত্রিত সমাজের বিভীষিকা আমরা দেখেছি—আজকের দিনে পৃথিবীতে অনিয়ন্ত্রিত সমাজের আর স্থান নেই। তাই আমাদের বিবেচনার একমাত্র বিষয় নিয়ন্ত্রণের রূপ, এবং সেজন্য চাই সংস্কারবর্জ্জিত চিত্ত, সেজন্য চাই পৃথিবীর বহু-বিচিত্র সমাজের পরিচয়, সেজন্য চাই বলিষ্ঠ ও স্বাধীন বুদ্ধি। জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন ও বিচারের মধ্যে যদি আজ আমরা বুদ্ধির স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবেই ছাত্র হিসাবে আমরা সার্থক, আমাদের এ সম্মেলন সার্থক।

দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্রসম্মেলন, আষাঢ় ১৩৪৪

মুসলমান ছাত্র ও রাজনীতি

আজ আপনাদের এ সম্মেলনে যে আমাকে ডেকেছেন, সেজন্য আমি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রীহট্ট বাংলা দেশেরই অংশ। বাংলার সঙ্গে তার প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও ভাষাগত ঐক্য। রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে শ্রীহট্ট তবু বাংলার বাইরে। আমরা চাই বাংলার শ্রীহট্ট আবার বাংলায় ফিরে আসুক।

আপনারা আমাকে আজ ডেকেছেন। কী কথা আপনাদের কাছে আমি বলতে পারি? কোন বাণী শোনাবার মত আকাঙ্ক্ষা বা স্পর্দ্ধা আমার নেই। নেহাৎ ঘরোয়াভাবে আপনাদেরই একজন হিসেবে আজ আমি কয়েকটী কথা বলতে চাই। বর্ত্তমান যুগ-সন্ধির দিনে যে সমস্যা আমাদের কাছে প্রবলতম, যে সমস্যা জাতির জীবনের সহজ পরিণতিকে জটিল করে তুলেছে, তারই সম্বন্ধে আমি দুয়েকটি কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করব।

বর্ত্তমান দিনে ভারতের সব চেয়ে বড় সমস্যা স্বাধীনতার সমস্যা। সে স্বাধীনতার অর্থ কেবলমাত্র রাজনৈতিক নয়—সামাজিক এবং অর্থনৈতিক তার বহুদিকের বহু রূপ। ইংরেজ যদি আজ এদেশের শাসনতন্ত্র চালাবার ভার মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর হাতে ছেড়ে দেয়, তবে অনেকে হয়তো তাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলবেন, কিন্তু দেশের বিপুল জনসাধারণের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার হাহাকার, তাদের সহস্র অপমান ও লাঞ্ছনার কি তাতে অবসান হবে? ইয়োরোপের গত শতকের ইতিহাস আমাদের কি শেখায়? বর্ত্তমান শতকে ইয়োরোপ সামাজিক

নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক সাম্যের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের পরিণতি খোঁজে কেন? ইয়োরোপের দেশে দেশে আজ সমাজের বিভিন্ন কর্ম্মধারার মধ্যে রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ, দেশের ধনসম্পদের ব্যবহারে ও পরিপূরণে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার ছড়াছড়ি কেন?

অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন অর্থ নেই। কিন্তু তবুও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার ভিত্তি। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিণতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় এবং সামাজিক স্বাধীনতায় তার পূর্ণতা। তাই আমাদের প্রথম সংগ্রাম রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য। রাষ্ট্রীয় মুক্তি-সাধনার মধ্যে আমরা স্বাধীনতার সম্পূর্ণ রূপের পরিকল্পনা, স্বাধীনতার বিচিত্র প্রকাশকে সফল করবার সামর্থ্য ও ইঙ্গিত খুঁজে পাব।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন ছাত্র সম্মেলনে এ সমস্ত কথার কি স্থান আছে? কিন্তু ছাত্র হিসাবে আমাদের যেগুলি বিশেষ সমস্যা, তার সমাধানও কি আমরা ছাত্র জীবনের পরিসরের মধ্যে করতে পারি? বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ধারার আমরা আমূল পরিবর্ত্তন চাই। কিন্তু রাজনৈতিক শক্তিলাভ ভিন্ন কি সে ক্ষমতা আমরা অর্জ্জন করতে পারি? আমাদের দেশের শিক্ষাধারা পরাধীন দেশের জন্য—স্বাধীন চিন্তার সেখানে অবকাশ অল্প, কারণ স্বাধীন চিন্তা ও রাজনৈতিক পরাধীনতা পরস্পর বিরোধী। মেকলের সময় থেকে এ সম্বন্ধে ধারণার বেশী বদল হয়নি। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল রাজকার্য্যের সৌকর্য্যের জন্য কেরাণী তৈরী—যারা আদেশ নেবে, আদেশ দেবে না; যুক্তিতর্ক করবে না, বিচার করবে না, কেবলমাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দ্দেশ গ্রহণ করবে।

শিক্ষার শেষে আমাদের যুবকদের সামাজিক ব্যবহারের ও সমাজসেবার প্রশ্ন কি ছাত্রজীবনের সমস্যা, না রাজনীতির প্রশ্ন?

শিক্ষিত যুবকদের বেকার সমস্যা দিন দিন গুরুতর হয়ে উঠছে, অথচ তার সমাধান ছাত্রজীবনের সীমানার মধ্যে নেই। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও নতুন সমাজের পরিকল্পনার কথা এখানে আসে। বর্ত্তমান সমাজ জীবনের নৈরাশ্য দূর করতে না পারলে বেকার-সমস্যা মেটাবার আশ্বাস কই? তাই ছাত্র হিসাবে রাজনীতিকে ইচ্ছা করলেও বর্জ্জন করা চলে না—আমরা কম্বলকে ছাড়তে চাইলেও কম্বল তো আমাদের ছাড়ে না।

আবার অন্যদিক থেকেও ছাত্রজীবনে রাজনীতির সঙ্গে যোগ বাঞ্ছনীয়। কম্বল ত্যাগ করবার চেষ্টাও ভুল। সমাজের সমষ্টিগত জীবনের প্রতিরূপ রাজনীতি, তাই সমাজে থাকতে হলে রাজনীতিকে এড়ানো যায় না। আবার না এড়ালে প্রয়োগ ও মতবাদের মধ্যে পার্থক্য-রেখা টানব কোথায়? অতএব অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের দিক থেকে ছাত্রজীবনে রাজনীতির যোগ বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে রাজ-নৈতিক অসফলতার কারণ কি এই বিয়োগের মধ্যেই মেলে না?

আমার মনে হয় বিশেষ করে মুসলমান ছাত্রদের বেলায় একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। নেতৃত্বের অভাবে আমরা আজ পিছিয়ে পড়েছি, সে অভাব দূর করতে হলে আজ আমাদের বিশেষ চেষ্টা ও সাধনার প্রয়োজন। গত ১০০।১৫০ বৎসরের মুসলমানের ইতিহাস পতনের ইতিহাস, পরাজয়ের ইতিহাস। তাই সেদিনকার মনোবৃত্তি আজো যাঁদের আছে, তাঁরা পরাজয়ের চোখে রাজনৈতিক আন্দোলনকে দেখেন, তাঁদের মনোবৃত্তি কেবলমাত্র সন্তর্পণে সতর্কভাবে আপনাকে রক্ষা করে চলবার মনোবৃত্তি। তাই তাঁদের মুখে এক কথা—মুসলমানের জন্য চাই রক্ষাকবচ, চাই বিশেষ বন্দোবস্ত, চাই দুর্ব্বলের অপরের প্রতি নির্ভরতা।

জিন্না-রাজনীতি ও ধামাধরা রাজনীতির মূল কথাও এইখানেই মেলে। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে যোগদানে তুই দলই বিমুখ। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দোহাই দিয়ে তাঁরা বলেন যে আমরা শক্তিশালী হয়ে তবে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করব, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়ব। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সম্বন্ধে আমি তু চারটী কথা পরে বলব। এখন শুধু বলতে চাই যে তাঁদের যুক্তি যদি আমরা মেনেও নিই, সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা যদি চাইও, তবুও তাঁদের কর্ম্ম-পদ্ধতিতে সে স্বার্থরক্ষার উপায় কই?

তাঁরা বলেন যে শক্তিশালী হয়ে তারপর আমরা দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দেব, কিন্তু শক্তিশালী হবার উপায় যে কী, সে সম্বন্ধে তাঁরা হয় নির্ব্বাক, নয় অস্পষ্ট। তাঁদের কথায় মনে হয় যে রাজনৈতিক সংগ্রামের বাইরে থেকে, রক্ষাকবচ দাবী করে, বিদেশীর সঙ্গে রফা করে, তাদের উপরে নির্ভর করে আমরা শক্তি সঞ্চয় করতে পারব। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে সংগ্রামে যোগ না দিয়ে শক্তিশালী হবার কোন উপায় নেই। জলে না নেমে যেমন সাঁতার শেখা যায় না, ডাঙ্গার সমস্ত কসরৎই যেমন জলের মধ্যে নিরর্থক, পরাধীন দেশে মুক্তিসংগ্রামে যোগ না দিয়ে শক্তি সঞ্চয়ের স্বপ্ন তেমনি নিরর্থক। জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করে, স্বার্থত্যাগ দিয়ে, তুঃখ সয়ে, বেদনার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদিগকে শক্তিশালী হতে হবে। ত্যাগ এবং তুঃখ স্বীকার ভিন্ন শক্তি অর্জ্জনের স্বপ্ন বাতুলতা, কাঁচের ঘরে বসে মোমের পুতুলের মুখে শক্তির কথা শোভা পায় না।

এ সম্বন্ধে আরো আমি বলব যে আজ যদি তাঁরা আবদার ধরে

বসে থাকেন, ইংরেজের দৌলতে হিন্দুর সঙ্গে ভাগবাটোয়ারার বন্দোবস্ত সুবিধা মতন করেও নেন, তবু সে ভাগবাটোয়ারা, সে চুক্তি, সে বন্দোবস্ত যে টিকবে তার আশ্বাস কোথায় ? শক্তি না থাকলে সন্ধির কোন মূল্য নেই সে কথা আমরা বারে বারে দেখেছি। দেখেছি যে সশস্ত্র রাজ্যও শক্তির ভ্রূকুটিতে সন্ধিপত্রকে ছেঁড়া কাগজের টুকরা বলে অবহেলায় পদদলিত করে। দেখেছি যে দুর্ব্বল বেলজিয়ামের কোন যুক্তিতর্ক, কোন সন্ধি-প্রতিজ্ঞার দোহাই জার্ম্মানী শোনে নি। এই ভারতবর্ষে দেখেছি যে মহাযুদ্ধের বিপদকালের সমস্ত প্রতিজ্ঞা ও ঐকান্তিক প্রতিশ্রুতি বিজয়ী ইংরেজ শক্তিমদে অবহেলায় অগ্রাহ্য করেছে। আজ দেখছি যে শক্তিমান জাপান সন্ধিপত্রকে অবহেলা করেই তার রাজনীতিকে চালনা করছে। তাই হিন্দুর সঙ্গে যাঁরা চুক্তি করতে চান, বলেন যে চুক্তি না হলে, ভাগবাটোয়ারা ঠিক না হলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়া উচিত নয়, তাঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য যে স্বাধীনতা কি কেবলমাত্র হিন্দুরই কাম্য ? সে স্বাধীনতায় কি আমাদের দাবী নেই ? আর যদি চুক্তিতেই আমরা বিশ্বাস করি, সে বিশ্বাসের ভিত্তি যে কত দুর্ব্বল তা বারে বারে দেখেও কি আমরা শিখব না ?

ইংরেজ যখন এদেশে এল, তখন তাদের শিক্ষা, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে অসহযোগের ফলে আজ আমরা পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে পড়েছি। আজও কি এই স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ না দিয়ে আমরা আবার সেই ভুলই করব ? আবার পঞ্চাশ বৎসর পরে একদিন হঠাৎ চোখ মেলে দেখব যে ত্যাগে, সামর্থ্যে, দুঃখসহনের শক্তিতে আমরা আবার সেই পঞ্চাশ বৎসর পিছেই পড়ে আছি ! বারে বারে ঠকেও কি আমাদের শিক্ষা হবে না ?

আরো একটা কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই। শক্তি নির্ভর করে মনোবৃত্তির উপরে, চিত্তের তেজ এবং সাহসের উপরে, তা নইলে সাত কোটী লোক কোনদিন দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়ে নিজেদের এমন করে বঞ্চনা করত না। আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু বলে সর্ব্বদাই ভয় পাই, সর্ব্বদাই মাইনরিটির বিশেষ ব্যবস্থা খুঁজে বেড়াই। কিন্তু সাত কোটী লোককে কি সত্যি সত্যি মাইনরিটি বলা চলে? সাতকোটী লোক দূরের কথা, সাতলক্ষ লোকের মধ্যেও যদি তেজ থাকে, নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকে, তবে পৃথিবীতে কাকে তারা ডরবে? আমরা এ কথা কেন ভুলে যাই যে মুসলমানের যেদিন গৌরবের দিন, যে যুগের ইতিহাস বিজয়ের ইতিহাস, সে যুগে মুসলমান সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদাই মাইনরিটি ছিল এবং সেই মাইনরিটি সাত কোটির মাইনরিটি নয়, সে মাইনরিটি ছিল কোথাও সাত শতের মাইনরিটি, কোথাও বা সপ্তদশ অশ্বারোহীর মাইনরিটি। আজও যে ইংরেজ আমাদের দেশে প্রভুত্ব করছে, সে কি সংখ্যাগুরুত্ব দিয়ে? বাংলার হিন্দুদের যে প্রতিপত্তি, তাও কি সংখ্যার জন্য?

আপনারা মুললমানের যৌবনের প্রতীক। আপনাদের ভুলতে হবে যে আপনারা মাইনরিটি, আপনাদের ভুলতে হবে যে আপনারা দুর্ব্বল। আপনাদের নিজের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে ঘোষণা করতে হবে যে আমরা অপরের উপর নির্ভর করে থাকব না; আমাদের মুক্তি, আমাদের অদৃষ্ট আমাদের নিজের হাতে গড়ব। আমি পূর্ব্বেও বলেছি এবং আবার বলি যে দুর্ব্বল আমরা নই, ভীরু আমরা নই, অশক্ত আমরা নই। আমাদের দুর্ব্বল করে রেখেছে ভীরু নেতৃত্ব। অশক্ত নেতৃবৃন্দ নিজেদের দুর্ব্বলতা সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে সমাজকে হীনবল করে ফেলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি গত শতাব্দীর দৃষ্টি, তাঁদের

মনোবৃত্তি পরাজয়ের মনোবৃত্তি। গ্লানি ও ব্যর্থতার মধ্যে তাঁরা গড়ে উঠেছেন বলে সেই পরাজয়, সেই গ্লানি ও সেই ব্যর্থতা তাঁদের দৃষ্টিকে আবিষ্ট করে রেখেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সেই ভীরু এবং পরাজিত নেতৃবৃন্দ আজ মুসলমান তরুণকে এসে বলছেন যে তারা দুর্ব্বল, তারা অশক্ত।

তাঁদের আপনারা বিদ্রোহদৃপ্ত কণ্ঠে বলুন যে আপনাদের যুগ জাতির জাগরণের যুগ। জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনের আবহাওয়ার মধ্যে আপনাদের জন্ম, গত শতাব্দীর গ্লানি ও পরাজয়ের সেখানে কোন স্থান নেই। আপনারা তরুণ, দেশের আপনারা ভবিষ্যৎ—পনেরো বিশ বৎসরের পরের রাজনীতি আপনাদের রাজনীতি। সেই ভবিষ্যৎ-বিজয়ের পূর্ব্বাস্বাদে আপনারা দৃপ্তকণ্ঠে বলুন যে দুর্ব্বলতার গ্লানি আমাদের নেই, বলুন যে দেশের তরুণকে যারা বারবার দুর্ব্বল বলে দুর্ব্বল করে ফেলে, তারা দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু।

বিগত যুগের দৃষ্টি দিয়ে যে সমস্ত ক্ষীণচিত্ত নেতা আপনাদের বলেন যে আগে শক্তিশালী হয়ে তারপরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা যোগ দেব, তাঁদের যুক্তির ব্যর্থতা আমরা আগেই দেখেছি। দেখেছি যে সংগ্রামে যোগ না দিয়ে শক্তিশালী হওয়ার স্বপ্ন বাতুলতা। দেখেছি যে শক্তির উৎস স্বাধীন মনোবৃত্তি, সতেজ চিত্তবল, যার বলে মানুষ একা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি পায়, নিজের অন্তরের সত্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আর কারু অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সন্তর্পণে বিপদ এড়িয়ে চলে শক্তিসঞ্চয় যদি সম্ভবও হত, তবু তার সময় কই? একথা আজ আমাদের ভুললে চলবেনা যে আমাদের দেশ পৃথিবীর একটি অংশ। বিশ্বরাজনীতির জটিল ঘাতপ্রতিঘাতের প্রবাহ এড়াবার আমাদের কোন উপায় নেই।

ইচ্ছা থাকলেও তাই শক্তিসঞ্চয়ের অবসর কই ? আজ যেভাবে বিপদ আসন্ন হয়ে এসেছে, তাতে কবে যে কোন জাতির ভাগ্যে কি ঘটে তা কি কেউ বলতে পারে ? তাই আমাদের নেতাদের মধ্যে যাঁরা সুখ-স্বপ্ন দেখেন, ভাবেন যে বিদেশের রাজশক্তির ছায়াতলে বসে তাঁরা ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বোঝাপাড়া করবেন, তাঁদের চিন্তা-শক্তির অভাবে অবাক হয়ে যেতে হয়। আজ যদি পশ্চিমে বিপদ আসন্ন হয়ে ওঠে, তখন কি মুসলমানের স্বার্থের কথা ইংরেজ একবারও ভাববে ? ভাবতে পারে ? ভাবা উচিৎ ? রোমক শাসনে ইংল্যাণ্ডের যে দুর্দ্দশা হয়েছিল, সে কথা কি কেবল ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে ? তা দেখেও আমরা শিখব না ? পৃথিবীর রাজনীতির পরাবর্ত্তে এমন অবস্থা অসম্ভব নয় যে ইংরেজকে এদেশ ছেড়ে দিতে হবে আত্মরক্ষার তাগিদে, শক্তির অভাবে। আজ যাঁরা সেই রাজশক্তির ছায়ায় শক্তি সঞ্চয়ের স্বপ্ন দেখছেন, সেদিন তাঁদের দশা কি হবে ?

আজ পশ্চিমে রাজনৈতিক যে দুর্দ্দৈব, প্রাচ্যে চীনজাপানের সমর পরিস্থিতিতে যে বিপদের সম্ভাবনা, তাতে যে কোনো দিন পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ ঘনিয়ে উঠতে পারে। সেদিন ইংরেজ ভারতবর্ষকে তুষ্ট করতে চাইবে, ভারতবর্ষের চিত্ত জয় করতে চাইবে। সেদিন ইংরেজ রফা করবে শক্তিমানের সাথে—দুর্ব্বলের সঙ্গে নয়। সেদিন ইংরেজ সন্ধি করবে তাদের সঙ্গে যারা নিজের বলে বিশ্বাসী, যারা দেশের মুক্তির জন্য প্রাণপণ করে শক্তি অর্জ্জন করেছে। যারা কেবলমাত্র ভবিষ্যতে শক্তি সঞ্চয়ের স্বপ্ন দেখে, তাদের দিকে ইংরেজ সেদিন ফিরেও তাকাবে না।

তারপরে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা। সে স্বার্থ কার স্বার্থ সে বিচার আমাদের করতে হবে। কার স্বার্থ আমরা চাই—দেশের বিপুল জনসাধারণের, না মুষ্টিমেয় অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ?

দেশের বিপুল জনসাধারণ হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে দরিদ্র, বঞ্চিত, সর্ব্বহারা। দরিদ্রের স্বার্থ হিন্দুমুসলমানখৃষ্টান নির্ব্বিশেষে এক। সে স্বার্থ খাওয়া পরার দাবী, সে স্বার্থ মানুষের ন্যূনতম অধিকার নিয়ে বাঁচবার দাবী। অনাহারে অর্দ্ধাহারে দুর্ভিক্ষে মহামারিতে যাদের জীবনযাত্রা, সে জীবন যাপনের অধিকারে স্বার্থের সংঘাত কতটুকু? তাই কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে, মজুর শ্রমিকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বিরোধ নেই। স্বার্থের সংঘাত লাগে চাকুরীর ভাগাভাগিতে, সমাজ সংগঠনের লাভের উপরিটুকু যাদের জোটে, কেবলমাত্র তাদের বেলায়। সেই লাভের ভাগাভাগি নিয়েই কাড়াকাড়ি। সেই কাড়াকাড়ির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরাও কি কেবলমাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজব? দেশের ছাত্রসমাজের সম্মুখে আজ তাই এই দুই পথ— সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা কাড়াকাড়ি নিয়ে দুয়েকজনের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, না দেশের বিপুল জনসাধারণের স্বার্থের মধ্যে আপনার মনুষ্যত্বের সাধনার সিদ্ধি?

মনে রাখতে হবে যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির কাড়াকাড়িতে ছাত্রসমাজের স্বার্থও পুরোপুরি মিটবে না, মিটতে পারে না। সব দেশে সব কালে সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরই ভাগ্যে চাকুরী জুটতে পারে। একজনের ভাগ্যে যদি জোটে, তবে নিরানব্বই জনই বাদ পড়তে বাধ্য। দেশের ছাত্রশক্তি, দেশের যৌবনশক্তি কি কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের সেই অনিশ্চিত লাভের লোভে দেশের বিপুল জনসাধারণের মঙ্গলের পথে বাধা দেবে, দিতে পারে? দেশের ছাত্রশক্তিকে তাই উদার দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত সমস্যা দেখতে হবে। সাম্প্রদায়িক বা শ্রেণীস্বার্থের ক্ষুদ্র সীমানা অতিক্রম করে দেশের বঞ্চিত ও প্রপীড়িত জনসমাজের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় নামতে

হবে। দেশের তরুণদের আজ তাই জিন্না-রাজনীতি বর্জ্জন করে দেখতে হবে নতুন ভারতবর্ষের স্বপ্ন। সে সাধনার মধ্যে দরকসাকসির চৌদ্দদফা নেই, তাতে রয়েছে দেশের স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা

জিন্না সাহেবের চৌদ্দ দফার অলোচনা করলেই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতির ফাঁকা মূর্ত্তি স্পষ্ট প্রকাশ হয়ে পড়ে। সে চৌদ্দ দফায় গণস্বার্থের বিন্দুমাত্র কথা নেই, বঞ্চিত চিরদরিদ্র মুসলমান শ্রমিক-কৃষকের ক্ষুধার হাহাকারের কোন আভাস সেখানে নেই, সেখানে রয়েছে চাকুরীর ভাগাভাগির কথা, সেখানে রয়েছে শ্রেণীস্বার্থের উলঙ্গ প্রকাশ। ছাত্রসমাজেও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকই বেশী, কিন্তু তবু তাদের তরুণ মন, তাদের নবীন উৎসাহ দিয়ে আজ তাদের শ্রেণী-স্বার্থের কথা ভুলতে হবে, তুলতে হবে জনগণের অস্বীকৃত স্বার্থের নবীন দাবী। যুগে যুগে মধ্যবিত্তশ্রেণীর তরুণেরাই পৃথিবীতে জনস্বার্থের দাবী তুলেছে, মেটাবার ভার নিয়েছে। আজ ভারতবর্ষের তরুণদের কাছেও ইতিহাসের সেই নিত্যকালের দাবী।

নতুন ভারতবর্ষ সৃজনের সেই স্বপ্ন আমাদের দেখতে হবে। তরুণ মন তরুণ দৃষ্টি দিয়ে আবার আমাদের দেশের ইতিহাসকে নতুন করে যাচাই করে নিতে হবে। সেজন্য ছাড়তে হবে মিথ্যা মোহ, সেজন্য ছাড়তে হবে ঐতিহ্যের ব্যর্থ অভিমান। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে আমরা দেশের অতীত ইতিহাসকে দেখব। দেখব তার মধ্যে ভরসার আভাস কোথায়। দেখব জাতির দুর্ব্বলতা বা পরাজয়ের কারণ কোন গ্লানির মধ্যে লুকিয়েছিল? নিজের কাছে নিজের দোষ ক্রটী ঢাকবার মত মূঢ়তা যেন আমাদের না থাকে। উটপাখীর মত নিজের মাথা লুকিয়ে আমরা দুনিয়াকে ফাঁকি দিতে পারব না, তাতে কেবলমাত্র আপনার সর্ব্বনাশের মাত্রাই বেড়ে যাবে। ভুল শোধরাতে হলে ভুলকে

আবিষ্কার করা চাই, তাই বুদ্ধির মুক্ত আলোকে যেন আমরা নিজেদের সমস্ত ভুল ত্রুটী সমস্ত দোষ গ্লানিকে স্পষ্ট করে দেখি।

বুদ্ধির সেই পূর্ণ স্বাধীনতা জাতির উন্নতির প্রথম উপাদান। সেজন্য যে সমস্ত আদর্শ আজ আমাদের কাছে প্রিয়তম, তাদেরকেও আবার যাচাই করে নিতে হবে। দেখতে হবে যে কেবলমাত্র কথার মোহে, কেবলমাত্র আবেগের ধোঁওয়া ও বাষ্পের মধ্যে যেন আমরা আমাদের কর্ম্মশক্তিকে বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ করে না দিই। আজ জাতীয়তার নামে যে বাড়াবাড়ি অনেকস্থলে আত্মপ্রকাশ করে, না বুঝে না শুনে কেবলমাত্র জনতার বুদ্ধিবিভ্রান্ত আবেগের যে মত্ত প্রকাশ তাকে দেখতে হবে বিজ্ঞানের মুক্ত দৃষ্টিতে, তাকে দেখতে হবে বিশ্বসভ্যতার পরিণতির দৃষ্টিকোণ থেকে। কেবলমাত্র আবেগ, কেবলমাত্র মাতামাতি করে দেশ স্বাধীন হয় না, কোনদিন হয়নি। দেশকে স্বাধীন করতে হলে চাই সুনিয়ন্ত্রিত আবেগ, যুক্তির নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়ে প্রাণপ্রবাহের প্লাবন। দেশের স্বাধীনতার সাধনায় আমাদের আবেগকে বুদ্ধি দিয়ে সংহত ও চালিত করতে হবে।

ভারতের আজ যে সভ্যতা তা হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়। সে সভ্যতা যুগ্ম সভ্যতা, তার মধ্যে হিন্দুমুসলমান সকলেরই প্রভাব প্রতিফলিত। তাই সে সভ্যতা নিয়ে কেবলমাত্র হিন্দুর মিথ্যা দর্পের কোন অর্থ হয় না—মুসলমানের সে সভ্যতাকে বর্জ্জন করবার প্রয়াস ও নিরর্থক। হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে আজ আমাদের বুঝতে হবে যে সে সভ্যতার আজও পরিণতি হয়নি, হয়েছে কেবলমাত্র সুরু। আমাদের সাধনা সেই সভ্যতাকে পরিপূর্ণ করা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মধ্যে তার পরিণতি খোঁজা। যদি আজ আপনারা সেই স্বাধীনতার সাধনা, সেই সভ্যতার সাধনাকে নিজেদের সাধনা বলে গ্রহণ করেন, তবেই আপনাদের এ সম্মেলন সার্থক।

সুরমা উপত্যকা মুসলমান ছাত্রসম্মেলন, আশ্বিন ১৩৪৪

স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতি

বাংলার জাতীয় জাগরণের আন্দোলনের বহুদিক থেকেই কুমিল্লা স্মরণীয়। যখন কোন শাসনতন্ত্রকে আমূল পরিবর্ত্তন করবার চেষ্টা হয়, পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র তখন প্রতিপদে বাধার সৃষ্টি, আঘাতের সৃষ্টি করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। নিদারুণ দুঃখবেদনার মধ্য দিয়ে সেই আঘাত সহ্য করে এগোতে না পারলে নতুন সমাজ নতুন রাষ্ট্র গড়বার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। সেই দুঃখসাধনায় ত্রিপুরা কোনদিন পিছুপা হয়নি। জাতির পুরাতন ইতিহাসের সমস্ত গ্লানি দুঃখের আগুণে জ্বালিয়ে নতুন ইতিহাস রচনার চেষ্টাই ত্রিপুরার গত দুই তিন দশকের ইতিহাস।

ছাত্র জাতির এবং সমাজের অংশ। তাই জাতির জাগরণের আন্দোলনে ছাত্র পরাঙ্মুখ থাকতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাসেই তাই আমরা দেখি যে সমস্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রেই ছাত্র তার অংশ গ্রহণ করেছে—আন্দোলনে এনেছে তীব্রতা, এনেছে ক্ষীপ্রতা, এনেছে স্বার্থচিন্তানিষ্কলুষ আত্মত্যাগের প্রেরণা। বহুবার বহুক্ষেত্রে আমি বলতে চেষ্টা করেছি যে রাজনীতি-নিরপেক্ষ আত্ম-সমাহিত ছাত্রজীবনের পরিকল্পনা কেবলমাত্র স্বপ্নবিলাস। সমাজের নিবিড় সংগঠনের মধ্যে বাস করে সে সংগঠনের চাঞ্চল্য, সে সংগঠনের পরিবর্ত্তন ছাত্রকেও স্পর্শ করতে বাধ্য। তাই ছাত্র রাজনীতিকে এড়াতে গেলেও রাজনীতি ছাত্রকে এড়িয়ে চলবে না।

বিপদও কিন্তু সেইখানেই। রাজনীতিকে ছাত্র এড়াতে পারে না, কিন্তু যৌবনের সমস্ত আবেগ সমস্ত উদ্দামতা দিয়ে ছাত্র যদি

রাজনীতির আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলেও দেশের ভবিষ্যৎ সমস্যাময় হয়ে ওঠে। ছাত্র এবং যুবক দেশের ভবিষ্যৎ আশার প্রতীক। আজ যারা ছাত্র, কাল তাদেরই উপর পড়বে রাজনীতি পরিচালনার ভার। বর্ত্তমান জগতে রাজনীতি কেবলমাত্র আবেগ বা ভাববিলাসের সামগ্রী নয়—বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার বিচার করে আজ আমাদের দেশে রাজনীতির ধারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তার জন্য চাই অবকাশ, চাই কঠোর সাধনা, চাই বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও সাধনার সঙ্গে পরিচয়। আবেগ-উদ্বেল প্রেরণায় যদি ছাত্র আজ রাজনীতির স্রোতে ভেসে যায়, তবে সেই অভিজ্ঞতা, সেই পরিচয় লাভ করবার অবকাশ কই? সেইজন্য আমার বহুবার মনে হয়েছে যে রাজনীতির আন্দোলনের মধ্যে ছাত্রের পূর্ণ সহযোগিতা প্রথম দৃষ্টিতে কাম্য হলেও দেশের ভবিষ্যতের দিক থেকে সে বিষয়ে সন্দেহ উঠে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তনের তাগিদে অসহিষ্ণু হলে দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণহানির সম্ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে।

দেশের ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে তাই আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা এই দুই বিপদের মধ্য দিয়ে সন্তর্পণে আপনার কর্ম্মধারার নির্দ্দেশ। একপক্ষে রাজনীতিপরাঙ্মুখতা আত্মঘাতী এবং ঘটনার সংস্থানে বোধ হয় অসম্ভব। অন্যপক্ষে রাজনীতিসর্ব্বস্বতাও দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে হানিকর। তাই ছাত্রকে আজ রাজনীতির সঙ্গে যোগ রাখতে হবে, অথচ রাজনীতির মধ্যে আবেগের প্রাবল্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে চলবে না। আবেগ যৌবনের ধর্ম্ম, অথচ সেই যৌবন ধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করেই আজ ছাত্রকে আপনার কর্ম্মধারা স্থির করতে হবে।

একমাত্র বুদ্ধির সাধনা—বুদ্ধির স্বাধীনতা দিয়েই তা সম্ভব। তাই আজ ছাত্র আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হবে বুদ্ধির স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা।

আমাদের দেশে আবেগের প্লাবন বহুবার আমরা দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে একথাও দেখেছি যে সে প্লাবনে সমাজে কোন বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন হয়নি। যে পরিমাণ উদ্যম, যে পরিমাণ আশা, যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগ এবং সাধনার পরিচয় আমরা পেয়েছি, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে সে পরিমাণ সার্থকতা মেলেনি। তার একমাত্র কারণ যে অনিয়ন্ত্রিত আবেগ দিকহীন। তাই চারিদিকে চাঞ্চল্য তাতে জাগে, কিন্তু সম্মুখের অটল পাহাড়ের স্তূপ তাতে ভেসে যায় না। আমরা প্রায়ই শুনি বাড়ীতে যখন আগুন লাগে, তখন অন্য কোন চিন্তার সময় নেই, আবাল-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সবাইকে সেই আগুন নেবাতে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমরা জানি যে নরনারী শিশু যুবাবৃদ্ধ সবাই মিলে আগুন আগুন বলে হা হুতাশ করলে আগুন নেবে না। সবাই মিলে চারিদিকে ছুটাছুটি করলেও ঘর বাঁচে না—ঘর বাঁচাতে হলে, আগুন নেবাতে হলে চাই সংগঠন, চাই বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মধারা। বালক বা শিশুকে তখনো হয়তো আগুন থেকে সরিয়ে রাখাই প্রয়োজন, কারণ যারা আগুণের সঙ্গে যুঝবে, তারা চায় সবল সহযোগিতা, তারা চায় কর্ম্মের নির্ব্বিঘ্ন অবকাশ। আমাদের দেশে যে ভাববিলাস, যে আবেগ-উদ্বেলতা, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, বুদ্ধির শাসনের মধ্যে তাকে একান্ত ও শক্তিশালী করে তোলাই আজ তাই ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবেই ভাববিলাসের সমৃদ্ধি। যে বিষয়ে জ্ঞান বিশদ, সেখানে ভাববিলাসের অবকাশও অল্প। আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবালুতার মূলেও রয়েছে সমাজ-সংগঠন ও রাষ্ট্রগঠনের সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের অভাব। পরিচয়ের তীক্ষ্ণতার ফলে সমাজ বা রাষ্ট্রের যে সমস্ত গলদ এবং অবিচার প্রকাশিত হয়, সে

অন্যায় ও ত্রুটীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ভাবালুতার প্রয়োজন নেই। আবেগ সেখানে বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত এবং সেজন্য একান্ত। সংহত আবেগ প্রবাহের মধ্যে যে উদ্যম, তার শক্তি বিপুল, এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের ত্রুটী তার সম্মুখে টিকতে পারে না। তাই ছাত্র আন্দোলনের গোড়ার কথা বুদ্ধির সাধনা এবং স্বাধীনতা। সেই সবল মুক্ত বুদ্ধির প্রতাপে দেশের সমস্ত অভাব অভিযোগ স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের পথও নির্দ্দেশ করে দেবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে ভাবালুতার যে দুর্ব্বলতা, তার উল্লেখ করেছি। সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে পরিচয় নেই বলে, অথবা সে বিষয়ে আমরা ভাবিনা বলেই যে তা সম্ভব, সে কথাও বলেছি। তারই আরও একটা দিকের এখানে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের অতীত ইতিহাস যদি আমরা আলোচনা করি, তবে দেখতে পাই যে আমাদের কর্ম্মসাধনা ব্যক্তি, পরিবার বা বড় জোর গোষ্ঠির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ—প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনে তা প্রায় কোনখানেই বিকাশ লাভ করে নাই। তাই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা আদর্শের জন্য প্রাণপাতের দৃষ্টান্ত এ দেশে বিরল নয়, পারিবারিক স্বার্থের জন্যও ব্যক্তি আত্মদান করেছে; গোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য ত্যাগ ও সাধনারও প্রচুর দৃষ্টান্ত মেলে। কিন্তু জাতি বা দেশের জন্য যে প্রেরণা, তা আমাদের ইতিহাসে অল্প-দিনের আবির্ভাব, এবং সেইজন্যই আজও তা আমাদের মজ্জাগত হয়ে ওঠেনি! রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ বিদেশীর উপস্থিতি আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ অনেকটা জাগিয়েছে, কিন্তু সেখানেও যে এ উপলব্ধি নিগূঢ় নয়, বিদেশীর উপস্থিতিই তার প্রমাণ। একথা নিঃসন্দেহ যে দেশাত্মবোধ যদি প্রকৃতপক্ষে আজ সর্ব্বভারতকে কর্ম্মপ্রেরণা দিত, তবে বিদেশী এক-মুহূর্ত্তও এদেশে টিকে থাকতে পারত না। আমাদের রাজনৈতিক দলা-

দলির কারণও খানিকটা এরই মধ্যে মেলে—জাতীয়তার চেয়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই আজ পর্য্যন্ত আমাদের মানস সংগঠনে অধিকতর কার্যকরী, জাতির চেয়ে গোষ্ঠীর প্রতি অনুরাগ ও আবেদন আমাদের কাছে প্রবলতর।

রাজনীতি ক্ষেত্রের বাইরে একথা আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। বিদেশীর উপস্থিতির দরুণ সেখানে জাতীয়তাবোধের পরিচয় খানিকটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে আমাদের অনুভূতি বোধ হয় আজও গোষ্ঠী পর্যন্তও পৌঁছেনি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ এবং দ্বন্দ্ব এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই একমুখী প্রকাশ, কিন্তু নিছক সামাজিক ক্ষেত্রে তার পরিচয় আরো পরিস্ফুট। ব্যক্তি হিসাবে আমাদের মতন পরিচ্ছন্ন মানুষ পৃথিবীতে বেশী নাই—স্নান পোষাক সমস্ত বিষয়েই আমরা শুচিতাপ্রিয়। কিন্তু সামাজিক পরিচ্ছন্নতাবোধের কথা তুল্লেই আর সে মূর্ত্তি থাকে না। সামাজিক পরিচ্ছন্নতাবোধ, সমাজিক স্বাস্থ্য চিন্তা আমাদের একেবারে নাই বল্লেই চলে—ব্যক্তি বা বড় জোর পরিবারের ভাবনা করেই আমরা ক্ষান্ত। পরিবার বা গোষ্ঠী পর্য্যন্ত তাই আমাদের একাত্মবোধ পৌঁছেছে—আজ পর্যন্ত দেশ বা সমাজকে তা গ্রহণ করতে পারেনি।

ছাত্র আন্দোলনের বুদ্ধির সাধনার অন্যতম লক্ষ্য হবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডি অতিক্রম করে সামাজিক বোধের সৃষ্টি। এবং সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত তীক্ষ্ণ এবং নিবিড় হবে, সামাজিক বোধও ততই প্রবল হতে বাধ্য। সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবধারার নিগূঢ় সম্বন্ধ আজ অনস্বীকার্য্য। তাই আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও রূপের বিশ্লেষণের ফলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বোধের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যতদিন ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা পরিবার-

স্বাতন্ত্র্য প্রচলিত ছিল, ততদিন ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা পারিবারিক একত্ববোধ সমাজের ভাবধারায় প্রতিফলিত হতে বাধ্য। নিজের অথবা পরিবারের পরিশ্রম যখন সমাজের অর্থনৈতিক জীবনধারার অঙ্গে পরিণত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং উদ্দেশ্য নতুন লক্ষ্য খুঁজে পায়। তাই আমাদের ইতিহাসে এতদিন যে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় একত্ববোধের অভাব ছিল, তার মূলে সমাজের অর্থনৈতিক অপরিণতি। তা দূর করবার একমাত্র উপায় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক সংগঠনের রূপান্তর।

সমাজের বিপুল জন জাগরণের মধ্যে আপনার স্থান নির্দ্দেশে তাই ছাত্র আন্দোলনের সার্থকতা। বুদ্ধির সেই সাধনায় ছাত্র যেদিন বুঝবে যে দেশের যারা মেরুদণ্ড, সমাজের যারা সর্ব্বস্ব, সেই সর্ব্বহারা বঞ্চিত মানুষকে সমাজ সংগঠনে উপযুক্ত মর্য্যাদা না দিলে দেশের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মুক্তি কেবলমাত্র স্বপ্ন-বিলাস, তখনই দেশের ছাত্র আন্দোলন জয়যুক্ত হবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা আজ গুরুতর আকার ধারণ করেছে এবং সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি বহু ক্ষেত্রে বহুবার প্রকাশ করেছি। আজ কেবল এইটুকু বলব যে সে সমস্যা কেবল মাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যা। ছাত্র আন্দোলন যদি কেবলমাত্র ছাত্রের সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে ছাত্র আন্দোলনেও সাম্প্রদায়িক সমস্যা এসে পড়বে। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ তা আসছেও। কারণ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর ভাগবাটোয়ারার যে কলহ নিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোষ্ঠীভুক্ত হিসাবে ছাত্রেরাও সে কলহে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ছাত্র আন্দোলন গোষ্ঠীর সীমানা অতিক্রম করে সমস্ত দেশ এবং সমস্ত বিশ্বের রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক সংগঠন বুঝতে চাইবে, এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন সমাজ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখবে,

সেই মুহূর্ত্তেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা তার কাছে অর্থহীন বলে ধরা পড়বে।

মূলতঃ ছাত্র আন্দোলনের সমস্যা তাই এক। বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তির উপর আমাদের কর্ম্ম প্রেরণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এবং সেই বাস্তব জ্ঞানের সাধনাই ছাত্র আন্দোলনের সাধনা। সমাজ-সংগঠনের নিবিড় সংযোগ এবং পরস্পরনির্ভরতার ফলে ছাত্র আন্দোলন সমাজের নতুন প্রতিচ্ছবি এনে দেবে। সমাজের বঞ্চিত এবং চির-নিপীড়িত জনসাধারণের মুক্তির স্বপ্ন তারই মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সে মুক্তি কেবল বিদেশীর অধীনতা থেকে মুক্তি নয়, অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক দাসত্বশৃঙ্খল যে বিচিত্র রূপে সমাজের পূর্ণবিকাশকে ব্যাহত করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে বাধার সৃষ্টি করে, সেই দাসত্ব-শৃঙ্খল চূর্ণ করাই ছাত্র আন্দোলনের চরম লক্ষ্য।

২

ছাত্র আন্দোলনের বুদ্ধির মুক্তির সাধনার কথা কাল আপনাদের কাছে বলেছি। বলেছি যে শ্রেণী এবং সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ স্বার্থকে অতিক্রম করে পৃথিবীর বিপুল বঞ্চিত জনসাধারণের স্বার্থকে আপনার স্বার্থ বলে গ্রহণ করতে না পারলে ছাত্র আন্দোলনের কল্যাণ নেই। সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের স্বার্থগত যে বিরোধ, সে বিরোধকে এড়া-বার একমাত্র উপায়ও সেইখানে, কারণ সাম্প্রদায়িক সমস্ত কলহের মূলে মধ্যবিত্ত এবং বিত্তশালী শ্রেণীসমূহের স্বার্থ সন্ধান। পৃথিবীর ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস এবং উদ্দেশ্যের মধ্যেও তার পরিচয় মেলে।

আপনারা সকলেই জানেন যে ছাত্র আন্দোলন একান্ত ভাবে বিংশ-শতাব্দীরই অভিব্যক্তি। বিংশ শতাব্দীতেও মহাসমরের পূর্ব্বে তার

বিশেষ কোন লক্ষণ বা প্রকাশ ছিল না। আমি বলতে চাইনে যে মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কোনদিন ছাত্রদের মধ্যে কোন আন্দোলন হয়নি, অথবা রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লবে ছাত্র তার অংশ গ্রহণ করেনি। আমার বক্তব্য শুধু এই যে ছাত্রেরা পূর্ব্বে এ সমস্ত আন্দোলনে যোগ দিলেও ব্যক্তিগত হিসেবেই দিয়েছে—সংঘবদ্ধভাবে ছাত্রসমাজ পূর্ব্বেকার কোন আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করেনি। বর্ত্তমানে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই যে সুসংবদ্ধ এবং সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন, মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তার অস্তিত্ব ছিলনা বললেই চলে। যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরে এ ভাবে ছাত্র আন্দোলন প্রসারলাভ করল কেন, সে কথাও আমাদের বিশেষ করে বিচারের বিষয়।

এই সঙ্গে আর একটী বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ছাত্র আন্দোলনের পতাকা আপনারা তুলেছেন—সে পতাকার বাণী স্বাধীনতা, শান্তি এবং প্রগতি, পৃথিবীর দেশে দেশে ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। আপনারা কি ভেবেছেন যে আরো বহু আদর্শ, আরো বহু লক্ষ্যের মধ্যে এই তিনটীকেই ছাত্র আন্দোলন কেন বেছে নিল ? সে সম্বন্ধে যদি আমারা আলোচনা করি, যদি এ আদর্শের তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করি, তবে সেই সঙ্গেই ছাত্র আন্দোলন যে কেন মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই গড়ে উঠল, তারও ইতিহাস আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য স্বাধীনতা, শান্তি এবং প্রগতি—ছাত্র আন্দোলনের সংঘবদ্ধ বিকাশ ঠিক মহাযুদ্ধের পরে। এ দুটী জিনিষ মনে রাখলে এবং তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ঠিক ভাবে উপলব্ধি করলে সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপও আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

মহাযুদ্ধের পরে কি এমন অবস্থা হয়েছিল যার জন্য দেশে দেশে ছাত্র আন্দোলন স্বত-উৎসারিতভাবে আত্মবিকাশ করল? মহাযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে কারা তার বিচার করলেই এ কথার উত্তর পাওয়া যাবে। প্রতি দেশেই প্রাণ দিয়েছে তরুণেরা। তারা জীবনের আনন্দ, জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসাকে ঢেলে দিয়েছে কিসের জন্য? প্রতি দেশেই একই রব—দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশের গৌরবের জন্য, দেশের আত্মবিকাশের জন্য এ মহাযুদ্ধ। প্রতি দেশেই গির্জ্জায়, স্কুলে, কলেজে, বক্তৃতামঞ্চে একই ধ্বনি উঠেছে—ন্যায়ের জন্য, সত্যের খাতিরে আদর্শের তাগিদে এ যুদ্ধ! প্রাণ দিয়েছে কিন্তু তরুণেরা। তারা শুনেছে যে পৃথিবীতে চিরকালের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসানের জন্য তাদের এ উৎসর্গ। যুদ্ধের শেষে কিন্তু দেখা গেল যে চিরকালের মত যুদ্ধের অবসানের জন্য যে মহাযুদ্ধ, তার পরিণতিতে যে শান্তি, তার ফলে পৃথিবী হতে শান্তির চিরনির্ব্বাসনের ব্যবস্থাই হয়েছে।

যুদ্ধ হতে প্রত্যাগত তরুণেরা দেশে দেশে একথা ভেবেছে। স্বভাবতই এ সমস্যা তাদের মনে উঠেছে যে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই আত্মরক্ষার জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করল কেমন করে? প্রত্যেক দেশই বলেছে যে তার অভিযান কেবলমাত্র ন্যায়ের জন্য, সত্যের মর্য্যাদায়। কিন্তু যুযুধমান প্রতিপক্ষ দেশগুলি সকলেই ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করলে, সে ন্যায়ের, সে সত্যের স্বরূপ কি? তাই দেশে তরুণেরা ভাবতে লাগল—যুদ্ধ কেন? যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? কোন অভিলাষ, কোন আদর্শ সাধনের জন্য মানুষের সঙ্গে মানুষের এ সংগ্রাম?

সেই আত্ম-বিশ্লেষণ, সেই ভাবনার ফলেই ছাত্র আন্দোলনের জন্ম। সেই জন্যই ছাত্র আন্দোলন একান্তভাবে যুদ্ধপরবর্ত্তী যুগের

বিকাশ। সেই জন্যই ছাত্র আন্দোলনের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা, শান্তি এবং প্রগতি।

ছাত্র আন্দোলনের গোড়ার কথা—স্বাধীনতা। যুদ্ধে যে সমস্ত তরুণ গিয়েছিল, তারা দেখল যে এক দেশ অন্য দেশকে অধিকার করে গ্রাস করতে চায় বলেই পৃথিবীতে অশান্তি, পৃথিবীতে বিপ্লব। মানুষ রাজনৈতিক জীব বটে কিন্তু রাজনীতিকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টাই সাধারণ মানুষের প্রকৃতি। সাধারণ মানুষ চায় যে নিরুদ্বেগ শান্তিতে কোনভাবে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দেবে, তাই অসহ্য দুঃখ গ্লানি বা অসুবিধা না হলে সাধারণ মানুষ রাজনীতিতে যোগ দিতে চায় না। পরাধীন দেশে কিন্তু পদে পদে সেই বাধা ও নিষেধ চিত্তের প্রকাশকে ব্যাহত করে, সহজ এবং স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের সম্ভাবনাকে ধ্বংশ করে। তার কারণও স্পষ্ট। এক দেশ অন্য দেশকে জয় করে অধীন করে রাখতে চায় কেন সে প্রশ্ন তুললেই আমরা দেখতে পাই যে প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই এক দেশ অন্য দেশকে জয় করে।

সাম্রাজ্যের গৌরব, জাতীয় গর্ব্ব এ সব কারণ যে নেই, তা আমি বলতে চাইনে, কিন্তু সে সব কারণ তো সব দেশেই রয়েছে। তাই এক দেশ অন্য দেশকে জয় করতে চায়, জয় করতে পারে কেবল তখনই যখন বিজয়ী দেশ বিজিত দেশকে নিজের পণ্যসামগ্রীর বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। ইংরিজিতে কথা আছে, Trade follows the flag—পতাকার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা—সে কথার মর্ম্মও এই। প্রত্যেক দেশই চায় যে অন্য দেশে নিজের উৎপন্ন জিনিস বিক্রয় করে সে দেশের অর্থ নিজে আহরণ করবে। প্রত্যেক দেশই চায় যে অন্য দেশের জিনিস ব্যবহার করে দেশের অর্থ বিদেশে যেতে দেবে না। দেশ অর্থে অবশ্য এ ক্ষেত্রে দেশের ধনিকদেরই বোঝায়। তারা খোঁজে

নিজেদের লাভ এবং সেই লাভের লোভে দেশকে ছেড়ে তারা বিদেশকেও গ্রাস করতে চায়। বিদেশের অর্থ এসে দেশে জমে এবং সেই অর্থের কিঞ্চিৎ অংশ দেশের দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্যেও জোটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে যে একশ বৎসর আগে ইংলণ্ডের গ্রামে সপ্তাহে ত্নদিন মাংস খেতে পারত এ রকম লোক বেশী ছিল না। অথচ সেই ইংলণ্ডেই আজ যার দিনে ত্নবেলা মাংস জোটে না, সে নিজেকে হত-ভাগ্য মনে করে, আর যার কাজ জোটে না, সেই বেকারও সরকার থেকে সপ্তাহে চৌদ্দ টাকা ভাতা পায়।

ধনতন্ত্রবাদ এমনি করে গড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে সাম্রাজ্য, কারণ বিদেশে জিনিষ বিক্রয় করবার জন্য রাজনৈতিক প্রভুত্ব চাই। ইংরেজ আমাদের দেশে যে ভাবে তাদের কাপড়, তাদের অন্যান্য সওদা চালিয়েছে, অন্য দেশে কি তা পেরেছে? কিন্তু ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্য-বাদের বিপদও সেইখানে। অন্যান্য দেশ দেখল যে সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতন্ত্রবাদের দৌলতে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি। তখন ফরাসী ভাবল, জার্ম্মানী ভাবল যে আমরাই বা বাদ যাব কেন? সঙ্গে সঙ্গে সে সব দেশেও ধনতন্ত্রবাদ গড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তারা চাইল নূতন নূতন বাজার, নূতন নূতন সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যলিপ্সু যুযুধমান শক্তিসমূহের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পৃথিবী ভরে উঠল।

কেবল মাত্র তাই নয়। কেবল বিভিন্ন দেশেই ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ এমনি করে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়নি—একই দেশের ধনতন্ত্রবাদের স্বাভাবিক স্ফুরণে আত্মবিরোধ প্রকাশ করেছে। আমরা দেখেছি যে ধনতন্ত্রবাদের শ্রীবৃদ্ধির দিনে দেশের দরিদ্রের ভাগে ধনিকের উদ্বৃত্ত অর্থের খানিক অংশ জোটে। ফলে দেশে জীবিকার মান বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মজুরের মজুরী,

জিনিষপত্রের দাম বেড়ে উৎপাদনের খরচ বাড়তে থাকে। যখন ধনিক দেখে যে তার লাভের পরিমাণ কমে এসেছে, তখন সে খোঁজে পৃথিবীর কোথায় জীবিকার মান নিচু, কোথায় কম মজুরীতে মজুর মিলবে, কোথায় জায়গা জমির দাম নামমাত্র। ধনতন্ত্রের এই স্বাভাবিক পরিণতিতে ধনিকের অর্থ বিদেশে চলে যায়। ধনিক ইংরেজ চেষ্টা করে যে তার অর্থ ভারতবর্ষে খাটিয়ে মুনাফার মাত্রা বাড়াবে।

মুনাফার মাত্রা তাতে বাড়ে, কিন্তু ধনতন্ত্রবাদের বিপদও ঘনিয়ে আসে। একেতো বিভিন্ন স্বাধীনদেশে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশে প্রত্যেক দেশই চায় যে কেবলমাত্র তার জিনিষই সমস্ত জগতে চলবে, প্রত্যেক দেশই চায় যে তার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে সূর্য্য ডুববেনা। তারপরে এসে জোটে অধীন এবং অর্দ্ধ-অধীন দেশে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ। সেখানেও কিন্তু বহুক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ধনিকেরই স্বার্থ জড়িত। ফলে যুদ্ধ বাধতে আর দেরী লাগে না। মানুষ শান্তি ও প্রগতির বাস্তবরূপ ভুলে গিয়ে মোহের টানে আত্মবিনাশে মেতে ওঠে।

যুদ্ধের পরে পৃথিবীর দেশে দেশে তরুণেরা একথা ভাবল। তারা দেখল যে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদই পৃথিবীতে যুদ্ধের গোড়ার কথা এবং পরাধীনতা, বিদেশ জয়ের উপরেই সে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। তারা দেখল যে যতদিন পৃথিবীতে কোনো দেশ পরাধীন থাকবে, ততদিন যুদ্ধেরও সঙ্কট ঘুচবে না; কারণ বিজয়ী দেশ তার উপরে প্রভুত্ব করতে চাইবেই, তাকে শোষণ করতে চাইবেই। স্বাধীনতা ভিন্ন সে পরাধীন দেশের দারিদ্র্যও ঘুচবে না, কারণ পৃথিবীর ইতিহাস আমাদের এই কথাই বলে যে রাজশক্তির সাহায্য, রাজশক্তির অনুকূলতা ভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হয় না, এবং পরাধীন দেশে রাজশক্তি দেশের শিল্প-বাণিজ্য বিনষ্ট করে বিজয়ী দেশেরই স্বার্থসিদ্ধি

করতে চাইবে। তাই পরাধীন দেশে সর্ব্বত্রই দারিদ্র্য, সর্ব্বত্রই অসন্তোষে ভরা—সঙ্কটের এক একটি সন্ধিস্থল। যতদিন সে বিক্ষোভের কারণ ঘুচবে না, ততদিন যুদ্ধের সম্ভাবনাও দূর হবে না, হতে পারে না।

তাই পৃথিবীর ছাত্র আন্দোলনের প্রথম এবং গোড়ার কথা-স্বাধীনতা। যতদিন সমস্ত দেশ স্বাধীন হবে না, ততদিন শান্তি আসবে না। কিন্তু অন্য পক্ষে পৃথিবীর সমস্ত দেশ স্বাধীন হলে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধেরও কারণ অন্তর্দ্ধান করে, শান্তি আপনা আপনি পৃথিবীতে আসে। তাই ছাত্র আন্দোলনের দ্বিতীয় লক্ষ্য শান্তি স্বাধীনতারই বিকাশের ফলে বাস্তব হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা এবং শান্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রগতি অবশ্যম্ভাবী। যেদিন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ স্বাধীনতা অর্জন করবে, শান্তিতে পরস্পরের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করে আত্মবিকাশের চেষ্টা করবে—সেদিন প্রগতির জন্য আর আলাদা সাধনা করতে হবে না, প্রগতি সেদিন নিজে থেকেই মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌বে। সেইজন্যই ছাত্র আন্দোলনের পতাকায় স্বাধীনতা প্রথম ও প্রধান স্থান পেয়েছে। সেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা অর্জ্জন আপনাদেরও লক্ষ্য হোক। তাতে কেবল ভারতবর্ষেরই স্বাধীনতা আসবে না—পৃথিবীর নিদারুণ সঙ্কটের অবসানও তারই মধ্যে মিলবে।

কুমিল্লা ছাত্রসম্মেলন, ফাল্গুন ১৩৪৪

সমাজ ও ব্যক্তি

চট্টগ্রাম ছাত্র সম্মেলনে আপনাদের আহ্বান আমি সানন্দে মেনে নিয়েছি। নিজের ব্যক্তিগত যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্ন তুলে সে আহ্বানের বিচার তাই আমার সাজে না। তা ছাড়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপরে আমরা অতিরিক্ত ঝোঁক দিই বলেই এ সব প্রশ্ন আমরা তুলি। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গত দুই তিন শতকে যে সভ্যতা বা কৃষ্টি রচনা করে তুলেছে, এ সমস্ত আলোচনা তারই ভাববিলাসের একটা দিক। আমাদের জাতীয় জীবনের যথাযথ বিকাশের জন্য নানাদিক থেকে তাই আজ আমাদের এই কথাটীই উপলব্ধি করতে হবে যে সমাজে যে সমস্ত শক্তি ও আন্দোলন সক্রিয়, তাদেরই ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। তাদেরই প্রতিভূ বা প্রতিনিধি হিসাবে ব্যক্তিত্ব সার্থক। তাই আজ আপনাদের আহ্বান আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে আমি সানন্দে ও সাগ্রহে মেনে নিয়েছি।

বাংলার জাতীয় জীবনের ইতিহাসে চট্টগ্রাম বরণীয় এবং স্মরণীয়। প্রকৃতি তার সৌন্দর্য্যের সম্ভার চট্টগ্রামে ছড়িয়ে দিয়েছে, সেই সৌন্দর্য্য মানুষের অন্তরকেও স্পর্শ করেছে। তাই স্বাধীনতার সংগ্রামে চট্টগ্রাম চিরদিনই অগ্রণী, এবং সেই অগ্রগতির দামও চট্টগ্রামকে কম দিতে হয়নি। আজ বহু বৎসর ধরে আপনাদের দুঃখ সাধনা আমাদের জাতীয় সংগ্রামের সম্পদ। সেই বেদনা ও নিপীড়নের মধ্য দিয়েই আপনারা জাতির নতুন ইতিহাসের ভিত্তি রচনা করেছেন, আরো দুঃখবেদনার মধ্য দিয়ে আমাদের সে ইতিহাসকে গৌরবময় করে

তুলতে হবে। কঠিন বাধা বিঘ্নের মধ্যেও যে আপনারা দৃপ্ত ভাবে নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, আজিকার এ ছাত্র সম্মেলন তারই একটি নিদর্শন।

গত আট দশ বৎসর আপনাদের উপর যে নির্য্যাতন ও অবমাননার লীলা চলেছে, তার কথা বাংলাদেশ কোনদিনই ভুলতে পারবে না। কিন্তু তাতে আশ্চর্য্য হবারও কোন কারণ নেই। প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে যাদের বিদ্রোহ, পুরাতন তন্ত্র তাদের আঘাত করবেই। সে অন্ধ আঘাতে কিন্তু বিদ্রোহ থামেনা। পুরাতন তন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধই তাতে প্রবলতর হয়ে ধরা দেয়। পৃথিবীর ইতিহাসে দমননীতি কোন দিনই শেষ পর্যন্ত টেকে নি, কিন্তু তবু দমননীতি সর্ব্বত্রই আত্মপ্রকাশ করেছে।

ছাত্রের পক্ষে যে রাজনীতি এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়, শাসনকর্ত্তাদের ব্যবহারেই তার পরিচয় মেলে। সে সম্বন্ধে আমার মতামত আমি বহু স্থলে বহু ভাবে ব্যক্ত করেছি। আজ আর তার পুনরুক্তি করতে চাইনে। শুধু এইটুকু বলেই আজ ক্ষান্ত হব যে ছাত্রজীবনে রাজনীতিকে এড়াতে চাইলেও এড়ানো যায় না। আর যদি এড়ানো যেতোও, তবু এড়ানো বাঞ্ছনীয় হত না। তাই বলে কিন্তু রাজনীতির আন্দোলনের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াও ছাত্রের পক্ষে সমীচীন নয়। আধুনিক যুগের রাজনীতির যে বহুমুখী প্রকাশ, অর্থনীতি ও সমাজসংগঠনের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতে তার যে বিচিত্র রূপ, তাকে বুঝতে না পারলে দেশসেবার সাধ স্বপ্নসাধই থেকে যায়, অথচ তাকে বোঝাও বহু সময়, বহু পরিশ্রম এবং বহু অধ্যয়ন সাপেক্ষ। শিক্ষকের বেলায়ও আমার বিশ্বাস যে সাক্ষাৎভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ না দিলেও তার সঙ্গে সংশ্রব রেখে তার ঘাতপ্রতিঘাত উপলব্ধি

করবার চেষ্টা করেই শিক্ষক ছাত্রের নেতৃত্বের দাবী করতে পারেন। ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে সম্বন্ধও তাতে সহজ হয়ে আসবে। কারণ তাদের রাজনৈতিক মতামত যদি নাও মেলে, তবু উভয় পক্ষে খোলাখুলি ভাবে পরস্পরকে জানবার ফলে সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ থাকবেনা। আজ ছাত্রের কাছে শিক্ষকের দাবী যে তার রাজনীতি থাকলেও সে বিষয়ে চেপে যেতে হবে, এবং ছাত্রও শিক্ষকের ব্যবহারে তাই দেখে, অথচ দুইজনেই জানে যে এ মুখোস কেবলমাত্র বাহিরের ভঙ্গিমা। তার ফলে দুই পক্ষেই সন্দেহ এবং বহুস্থলে সংঘাতও বেধে যায়। খোলাখুলিভাবে রাজনীতিকে স্বীকার করে নিলে বোধ হয় এ সন্দেহ বা সংঘাতের সম্ভাবনা থাকে না।

ছাত্রকে তাই রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব রেখে চলতে হবে। কিন্তু ভাবালুতার মধ্যে যেন সে সংশ্রব আমাদের গ্রাস করে না বসে। এ কথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে আমাদের দেশে যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগ আমরা দেখেছি, যে পরিমাণ দুঃখ ও নির্য্যাতন সহ্য করে জাতীয় সংগ্রাম চলেছে, তার উপযুক্ত প্রতিদান আমরা পাইনি। আজ তাই ভাববার সময় এসেছে যে এতখানি স্বার্থত্যাগ, এতখানি দুঃখসাধনা আজো কেন তার উপযুক্ত প্রতিদান আনে নি। আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের ভাবালুতা, আমাদের আবেগ সর্ব্বস্বতাই তার জন্য অনেকখানি দায়ী। বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবেই ভাববিলাসের সমৃদ্ধি এবং তা দূর করবার একমাত্র উপায় বুদ্ধির সাধনা—বুদ্ধির স্বাধীনতা। বুদ্ধির সাধনা সমাজ এবং রাষ্ট্রের গলদ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে ধরবে—ফলে আমাদের আবেগ হবে একান্ত, আমাদের কর্ম্মচেষ্টা হবে সুনিয়ন্ত্রিত এবং প্রবল।

বর্ত্তমান বাংলার কয়েকটি সমস্যার আলোচনা দিয়ে আমি এ কথা আপনাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই, এবং আমার বিশ্বাস যে বিশ্লেষণের ফলে আপনারা স্বীকার করবেন যে সমস্যাগুলি মূলতঃ এক। বুদ্ধির সাধনায় বর্ত্তমান সমাজ সংগঠনের গোড়ার গলদ ধরা পড়েনি বলেই এ সমস্ত সমস্যা, সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সামাজিক দৃষ্টি যখন তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠবে, তখন এ সমস্ত সমস্যার সমাধানও সহজেই মিলবে।

সন্ত্রাসবাদের কথা দিয়েই আমি আলোচনা সুরু করতে চাই। যে নির্য্যাতন আপনারা সয়েছেন, যে দমননীতি আজো চট্টগ্রামে সক্রিয়, সন্ত্রাসবাদ বা তার আশঙ্কাই তার মুল কারণ। অথচ বিশ্লেষণ করে দেখলে সন্ত্রাসবাদে দেশের মুক্তির ভরসা কতটুকু? গোড়াতেই বলেছি যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে কৃষ্টি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর তার প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে ব্যক্তিকে বড় করে দেখা তার পক্ষে স্বাভাবিক। আপনাদের মধ্যে যাঁরা ইতিহাস বা সাহিত্যের ছাত্র, তাঁরা বোধ হয় জানেন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তির স্বকেন্দ্রিক বিকাশের পরিচয় গত দুই তিন শতকেই মেলে। সেক্সপিয়রের মতন মহাকবিও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বড় করে দেখেননি, অথচ অষ্টাদশ শতকের সুরু থেকে সমস্ত সাহিত্য, সমস্ত কাব্যে ব্যক্তিত্বেরই পরাকাষ্ঠা। ইতিহাসেরও সাক্ষ্য তাই—অষ্টাদশ শতকের আগে পৃথিবীতে কোথাও ব্যক্তি, ব্যক্তি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা দাবী করেছে কিনা সন্দেহ। সন্ত্রাসবাদও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়েছে। গণ আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদ তাই পরস্পরবিরোধী, অথচ এই সহজ সত্য ভাবালুতার প্রাবল্যে ধরা পড়েনি বলে বাংলাদেশে

সন্ত্রাসবাদের ফলে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষতি প্রায় অপরিমেয়। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নয়। অন্যত্র সে বিশ্লেষণের চেষ্টা আমি করেছি, তবে এখানে বোধ হয় এটুকু বলা চলে যে সন্ত্রাসবাদ তিন ভাবে বাংলাদেশের বিপুল ক্ষতি করেছে। সন্ত্রাসবাদে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই অসামান্য সাহস ছিল, বুদ্ধি ছিল, স্বার্থত্যাগের শক্তি ছিল। গণ আন্দোলন চালাবার মতন ক্ষমতা তাঁদেরই ছিল, অথচ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মোহে গণ আন্দোলন থেকে দূরে সরে তাঁরা সন্ত্রাসবাদে নিজেদের ক্ষমতা এবং প্রাণেরও অপব্যয় করেছেন। বিদেশীরও তাতে সুবিধা কম হয়নি। সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে দেশে সমস্ত সংগঠনমূলক আন্দোলন বন্ধ করবার সুযোগ সরকারের মিলেছে, এবং তার ব্যবহারও হয়েছে পুরোপুরি। সে বিষয়ে আপনাদের কাছে বলা নিষ্প্রয়োজন। নিরন্তর সন্দেহ, আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকলে কর্ম্মপ্রেরণা পর্য্যন্ত যে কী ভাবে মলিন হয়ে আসে সে কথা আপনারা জানেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের ফলে দেশের সব চেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে গণ আন্দোলন তাতে গৌণ হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসবাদের ঝোঁক ব্যক্তির উপরে—ব্যক্তিকে বিনাশ করে শাসনতন্ত্র অচল করা তার কর্ম্মপদ্ধতি, কিন্তু এই ব্যক্তিসর্ব্বস্বতার ফলে যে সমস্ত অর্থ নৈতিক শক্তি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের কথা চাপা পড়ে গিয়েছে। দেশের বাস্তব অবস্থা, সংগঠন ও সমস্যার কথা না ভেবে সন্ত্রাসবাদী শাসনযন্ত্রের যন্ত্রীদের কথাই ভেবেছে। কংগ্রেসকে যে সন্ত্রাসবাদ দুর্ব্বল করেছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগের মধ্যে গণ আন্দোলনের যে সম্ভাবনা নিহিত, তাকে উপেক্ষা করে তার অহিংস কর্ম্মপদ্ধতির বিদ্রূপে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনে কংগ্রেসের প্রতি বিরাগ যে

জেগেছিল, একথা আজ অস্বীকার করা যায় না। তাই একদিকে সন্ত্রাসবাদের রোমান্তিক আকর্ষণ, অন্যদিকে কংগ্রেসের অসহযোগের আহ্বান—এই দোটানার মধ্যে যে বাঙ্গালীর চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, জাতীয় সংগ্রামে তার কুফল বহুব্যাপক। বাংলার যে দলাদলি আজ উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারও মূলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা, কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের ব্যক্তিবিশিষ্ট বিদ্রোহ।

নানা কারণে সন্ত্রাসবাদ আজ আর আমাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করেনা, কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত মনোভাব আজো সম্পূর্ণ কাটেনি। সে বিষয়েই আমি আরও একটু আলোচনা করতে চাই, কারণ আমার নিজের স্থির বিশ্বাস যে সেই মনোভাবই আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতির মূল কারণ। সাম্প্রদায়িক সমস্যাও আজ যে এত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার মূলে মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি। বহুবার বহুস্থলে আমি বলতে চেষ্টা করেছি যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা একান্তভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই সমস্যা। ভারতের বিপুল জনসাধারণের সব চেয়ে বড় সমস্যা জীবিকার সমস্যা। ক্ষুধায় তাদের অন্ন জোটেনা, পরিধানে তাদের বসন নেই। তাদের সে সমস্যা মেটাতে হলে মুসলমান হিন্দু নির্ব্বিশেষে সকলের খোরাক পোষাকের ব্যবস্থা করতে হবে, কাউকে ছেড়ে কারু সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যা জীবিকার সমস্যা হলেও তার রূপ ভিন্ন, তার প্রকৃতি এবং প্রতিকার দুইই আলাদা। সমাজের দুধ সরের প্রতিই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লক্ষ্য—তাই সে দুধ সরের ভাগাভাগি নিয়ে কলহ অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রতিনিয়তই আমরা দেখি যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা মূলতঃ ভাগবাটোয়ারার সমস্যা। বর্ত্তমান সমাজসংগঠনে সর্ব্বসাধারণকে

বঞ্চিত করে যে সুবিধাগুলি কেবলমাত্র কয়েকটি শ্রেণীর কুক্ষিগত, সে সুবিধাগুলির বণ্টন নিয়ে সাম্প্রদায়িক কোন্দল।

সন্ত্রাসবাদ যে মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তিরই রাজনৈতিক বিকাশ, ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতার ফলে ব্যক্তিকে নিধন করে শাসনতন্ত্রকে অচল করবার ব্যর্থ চেষ্টা, সে কথা আগে বলেছি। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখলেই চলে। বিপুল জনগণের উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্রীয়বোধই গণ আন্দোলনের ভিত্তি এবং সেই জন্যই গণ আন্দোলন প্রকাশ্য এবং বহির্মুখী হতে বাধ্য, কিন্তু সন্ত্রাসবাদ গোপন এবং অন্তর্মুখী বলে গণ আন্দোলনের সম্ভাবনাকেই বিনষ্ট করে দেয়। মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তির বিকাশ হিসাবে বাংলায় তাই সন্ত্রাসবাদের আবির্ভাব অনিবার্য্য ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্দ্ধানও আজ সমান অনিবার্য্য। তবু শ্রেণীস্বার্থ বা মধ্যবিত্ত-মনোবৃত্তি সহজে মরতে চায়না। যতদিন আমরা তার প্রকৃত স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি না করি, ততদিন নতুন ভাবে তা আমাদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে।

আজ বাংলায় যে 'বন্দেমাতরম'-কে জাতীয় সঙ্গীত করবার একটা উগ্র প্রচেষ্টা চলেছে, স্থিরভাবে বিচার করলে দেখব যে তারও মূলে এই মধ্যবিত্তমনোবৃত্তি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বহু বিবেচনার পরে সমস্ত দিক আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, মিটমাট হিসাবেই তার খানিকটা সার্থকতা ছিল। দুই পক্ষের বিরুদ্ধ মতবাদ মেটাতে গেলে দুই পক্ষকেই খানিকটা ছাড়তে হয়। কোন পক্ষই তাতে পুরোপুরি খুসী হয় না, কিন্তু তবু তা সত্ত্বেও মিটমাট মেনে না নিলে গোলমালও বাড়তে থাকে। বাংলার একটি শ্রেণী কিন্তু সে মিটমাট মানতে চায়নি—আজও চেষ্টা চলছে যে জোর করে কংগ্রেসের সে নির্দ্দেশকে উল্টাতে হবে। 'বন্দেমাতরম' জাতীয়' সঙ্গীত হতে পারে

কি না সে বিষয়ে *Indian Affairs*-এ শ্রী বুদ্ধদেব বসু এবং আমি গত জানুয়ারী মাসে খানিকটা আলোচনা করেছিলাম এবং দুই জনে এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলাম যে খানিকটা ধর্ম্মের ধোঁয়াভরা, খানিকটা ভাবালুতায় অস্পষ্ট সে গানটি হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের কল্পনা হিসাবে কার্য্যকরী বটে, কিন্তু ভারতের বঞ্চিত নিরন্ন নির্ব্বস্ত্র জনগণের কাছে তার বিশেষ কোন মূল্য নেই। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে নয়। কেবল লক্ষ্যণীয় এইটুকু যে ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন, বা মজতুর কৃষক আন্দোলনে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠছে, তার কাছে এ ধরনের সঙ্গীতের মূল্য বেশী নয়। আজ এখানে আমার বক্তব্য শুধু এই যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এ নিয়ে এভাবে মাতামাতি বা আন্দোলন মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তির পরিচায়ক। কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য বলেই প্রকাশ পেয়েছে।

এই কথাটি পরিষ্কার করে বুঝলেই আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হবে। বর্ত্তমানে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ধর্ম্মীয় ভাবধারার নিগূঢ় সম্বন্ধ আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না, অথচ সেই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখি যে যুগযুগান্ত ধরে মানুষের মধ্যে বঞ্চিতের সংখ্যাই অধিক। চিরদিনই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিসমূহ বিপুল সমাজকে শোষণ করে এসেছে, কিন্তু চিরদিনই সে শোষণকে ঢাকবার জন্য নতুন নতুন ভাবধারার বর্ম্ম সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলার স্বাতন্ত্র্য বা বাঙালীর বৈশিষ্ট্যকে যদি বড় করে তোলা যায়, তবে বাঙালীর মধ্যেই যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাকী সবাইকে শোষণ করছে সে কথা ঢাকা দেওয়া সহজ। তেমনিভাবে মুসলিম লীগ যে আজ মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করেছে, তারও মূলকথা এই শোষণের

নগ্নতাকে আবরণ করা। সমস্ত মুসলমানের স্বার্থ এক—এ কথার উপরে ঝোঁক দিয়ে মুসলমান জনসাধারণকে যদি ভুলিয়ে রাখা যায়, তবে তাতে মুষ্টিমেয় মুসলমান অভিজাত এবং মধ্যবিত্তেরই লাভ। ভারতবর্ষে আজ যে কলহের তাণ্ডব, তারও মূলে এই নবজাগ্রত মুসলমান মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তের স্বার্থ সংঘাত। হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত পুরাতন, মুসলমান মধ্যবিত্ত আজ কেবল গড়ে উঠছে, এবং এ সময়ান্তরের ঐতিহাসিক কারণ বোঝাও সহজ। কিন্তু তাদের মধ্যে স্বার্থসংঘাত যে কেবলমাত্র ব্যক্তি বা শ্রেণীগত স্বার্থেরই সংঘাত, এ কথাটি স্পষ্ট করে বুঝলে মুক্তির সন্ধানও আমরা সহজেই পাব। এ সমস্যা কেবল আমাদের দেশেরই সমস্যা নয়। কোথাও আর্য্যরক্তের পবিত্রতার দোহাই দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ঢাকবার চেষ্টা, কোথাও রোমের প্রাচীন গৌরবস্বপ্ন বা ইংরেজের সূর্য্যাস্তহীন সাম্রাজ্যগর্ব্ব দিয়ে অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাত ভোলবার সাধনা।

ছাত্র আন্দোলনের সার্থকতাও এইখানে। ব্যক্তি বা শ্রেণীগত স্বার্থকে স্বরূপে দেখবার শক্তি ছাত্র আন্দোলনের মধ্যেই আছে, কারণ সেই স্বার্থের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেই ছাত্র-আন্দোলনের সুরু। যুদ্ধের পরে স্বাধীনতা, শান্তি এবং প্রগতির বাণী নিয়ে ছাত্র-আন্দোলন গড়ে উঠল। সে বিষয়ে আমি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি, আজ এইটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট যে শ্রেণী-স্বার্থের প্রাবল্যে সমগ্র বিশ্বসভ্যতার যে বিপদ, তাকে উপলব্ধি করেই ছাত্র-আন্দোলনের জন্ম। বর্ত্তমান সভ্যতায় আজ ভাঙন ধরেছে, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, এবং স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের বিরোধই সে ভাঙনের মূল। শ্রেণী স্বার্থ বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের পথে সে বিপদকে এড়ানো যাবে না বলেই আজ

সমস্ত পৃথিবী ভরে নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্র গড়বার স্বপ্ন। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে মানুষের সাধনার ফলে আজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ পৃথিবী মেনে নিয়েছে। সে আদর্শে বিংশ শতাব্দীর দান এই যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন অর্থ নেই। ব্যক্তিগত বা শ্রেণী স্বার্থকে লঙ্ঘন করেই সে নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর, কিন্তু ব্যক্তিগত মোহ ও দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করবার একমাত্র উপায় বুদ্ধির সাধনা। আবেগ ও সুখদুঃখবোধ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে লঙ্ঘন করে সকলের জন্য আদর্শের ঐক্য স্থাপনের সূত্রপাত হিসাবেই আমি আজ আপনাদের ছাত্র-আন্দোলনকে অভিনন্দন করছি। বুদ্ধির সে সাধনায় সমস্ত সংস্কার, সমস্ত সহজাত এবং আহরিত প্রবৃত্তি ও স্বার্থবোধ বিপুল বিশ্বসমাজ প্রতিষ্ঠার কষ্টিপাথরে যাচাই করবার ক্ষমতা আপনাদের যদি আসে, তবেই আপনাদের আন্দোলনের ঐতিহাসিক সার্থকতা।

চট্টগ্রাম ছাত্র সম্মেলন, আষাঢ় ১৩৪৫

স্বাধীনতা ও সংগঠন

আজ আপনারা এ ছাত্র সম্মেলনে যে আমাকে ডেকেছেন সেজন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনাদের সে ডাক প্রীতির দাবী বলেই আমি মেনে নিয়েছি এবং প্রীতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার ওঠে না। সে বিষয়ে তাই আমি কিছুই বলব না। আমি এইটুকু বলব যে আজ আপনাদের সঙ্গে মিলে দেশের বর্ত্তমান সমস্যা, ছাত্র সমাজের চিন্তা ও ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনার এ সুযোগ, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের এ অবসর পেয়ে আমি আনন্দিত।

রাজনীতির সঙ্গে ছাত্র সমাজের সম্বন্ধের কথা আমি অনেক জায়গায় অনেক ভাবে অনেক বার বলতে চেষ্টা করেছি—আজ আর সে আলোচনার এখানে পুনরুক্তি করতে চাইনে। আপনারা জানেন যে আমার বিশ্বাস, ছাত্র রাজনীতিকে এড়িয়ে চলতে চাইলেও রাজনীতি ছাত্রকে এড়ায় না। কেবল ছাত্র বলে কেন, দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই রাজনীতিকে এড়িয়ে চলতে চায়। নিজের জীবনধারার গণ্ডির মধ্যে আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধবের প্রীতি ভালবাসা নিয়েই মানুষ সাধারণতঃ তুষ্ট। বাহিরের বিপুল পৃথিবীতে স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাতে যে বিষ ফেনিয়ে উঠে, রাজনীতি ও অর্থনীতির ভাবধারার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে যে আগুন সমস্ত পৃথিবীকে সঙ্কটময় করে তোলে, অধিকাংশ মানুষই সে কথা ভুলে থাকতে চায়। নিজের জীবনে যদি স্বস্তি মেলে, তবে পরের দুঃখ নিয়ে বিব্রত হতে চাওয়াকে

যে সাধারণ মানুষ মূর্খতাই মনে করে, বহু প্রবাদ ও নীতিকথার মধ্যে তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো তাই চিরদিনই সংসারবুদ্ধির কাছে নিন্দনীয়। কিন্তু বিপদ যখন আসন্ন, তখন সেই সংসার-বুদ্ধিকেই স্বীকার করতে হয় যে বনের মোষ না তাড়ালে ঘরের খাওয়াও সব সময়ে জোটে না। আদার ব্যাপারীরও তাই জাহাজের খবর নিতে হয়, কারণ জাহাজ না চললে আদার ব্যাপার বন্ধ হওয়াও বিচিত্র নয়। সাধারণ মানুষ তাই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, রাজনৈতিক জীবনে ভাগীদার, এবং বহুক্ষেত্রে অনিচ্ছায় এবং অজ্ঞাতে ভাগীদার বলে লাভের বদলে বিড়ম্বনাই তার ভাগে জোটে।

সমাজের সাধারণ মানুষের মতনই ছাত্রকেও তাই রাজনীতির সঙ্গে যোগ রেখে চলতে হয়, না রাখতে চাইলেও কম্বলী যে ছাত্রকে ছাড়ে না। যোগ রাখা যখন অনিবার্য্য, তখন সজ্ঞানে জাগ্রত বুদ্ধির সাহায্যে সে যোগ স্থাপনই শ্রেয়। ছাত্র এবং রাজনীতি উভয়ের পক্ষেই তাতে মঙ্গল। সে যোগ কতখানি নিবিড় হবে, ভাবনায় কাজে কর্ম্মে তা কী রূপে আত্মপ্রকাশ করবে, সে বিষয়ে মতভেদও প্রচুর। সাধারণ ভাবে কেবল এটুকুই বোধ হয় বলা যে ছাত্র রাজনীতির চিন্তাধারায় নিজেকে অভিষিক্ত করে রাখুক, প্রয়োজন মত রাজনৈতিক কর্ম্মধারার মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করুক, কিন্তু তাই বলে রাজনীতির সবেগ আন্দোলনের প্রাবল্যের মধ্যে ছাত্র যেন নিজেকে হারিয়ে না ফেলে। পৃথিবীতে রাজনীতির বিচিত্র লীলা চিরন্তন, ক্ষণিক বা সাময়িক সমস্যা ও সমাধানের মধ্যে তার শেষ খোঁজা ভুল। তাই অকস্মাৎ আবেগের প্লাবনে ছাত্র যদি সমস্ত সমস্যার সমাধান সহসা একদিনেই করতে চায়, তবে সমস্যার সমাধান

তো তাতে হবেই না, বরং ছাত্র নিজের কর্ম্মপ্রেরণা, নিজের আত্মচেতনার অপব্যয়ে ভবিষ্যতে সে সমস্যার সম্মুখে পরাজয় মানতেই বাধ্য হবে।

সেই কথাকেই অন্যভাবে বলা চলে। ছাত্রজীবনে রাজনীতির সমস্যা দুটী বিভিন্ন ও বিরোধী বিপদের মধ্যে সঠিক কর্ম্মধারা নির্দ্ধারণের সমস্যা। একপক্ষে রাজনীতিকে এড়িয়ে চলা অসম্ভব এবং সম্ভব ধরে নিলেও অবাঞ্ছনীয়, কারণ তার ফলে অনভিজ্ঞতা ও অব্যবহারে ভবিষ্যতের নাগরিকতা বিপন্ন হতে বাধ্য। অন্যপক্ষে রাজনীতিকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণেও বিপদ কম নয়। তার ফলে ভবিষ্যতের নাগরিক দেশ ও বিদেশের ইতিহাস, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের বিষয়ে যদি অনভিজ্ঞ থেকে যায়, আদর্শ ও আচারের বিবর্ত্তনে মানুষের সমাজ কোন পথে চলেছে সে বিষয় যদি তার স্পষ্ট ধারণা না থাকে, তবে, ভবিষ্যতের সমস্যা যখন নব নব রূপে তার সামনে আত্মপ্রকাশ করবে, তখন তার সমাধান করা কি তার পক্ষে সম্ভব হবে? তাই রাজনীতিকে এড়াতে চাইলেও যতখানি বিপদ, পুরোপুরি ভাবে জড়িয়ে ধরতে চাইলেও প্রায় ততখানিই বিপদ।

আমাদের দেশে অনেকেই বলে থাকেন যে সঙ্কটের দিনে এ সব বিষয়ে ভাবনার সময় নেই। ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন ছাত্রকে পড়ার বই ফেলে এসে বাইরে দাঁড়াতে হবে, সকলের সঙ্গে একসাথে বালতী করে আগুনে জল ঢালাই তার একমাত্র করণীয়। সেকথা হয়তো সত্য, কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাই বলে আমরা শিশুকে জল আনতে বলি না—জল সেখানেও কিশোর এবং তরুণেই আনে। সেখানেও ঘর বাঁচাবার একমাত্র উপায় সংঘবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সাথে আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ, তা নইলে আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই মিলে

হাহাকার করে ছুটোছুটী করলেই আগুন নেবে না। সেখানেও প্রয়োজন শক্তিশালী স্থিরবুদ্ধি নেতা। কথায় না বলে দিলেও সকলে তাঁর নির্দ্দেশ ও নির্দ্ধারণ অনুসারে কাজ করলেই সিদ্ধি অনিবার্য্য।

সে সম্পর্কে আরো একটী কথা মনে রাখতে হবে। আগুন যদি কেবল একবার লাগে, তবে সবাই হয়তো তাতে যোগ দিলে ফল ভালো হওয়াই সম্ভব। কিন্তু যে আগুন চিরন্তন, যে আগুন কোন দিন নেববার নয়, যে আগুনের সঙ্গে দিনরাত, যুগযুগান্তর যুদ্ধ করে কোন ভাবে মাথা গুঁজবার স্থানটুকু বাঁচিয়ে রাখতে হবে, সে আগুনের সঙ্গে লড়াইয়ে যদি সকলে একসঙ্গে একইভাবে মেতে উঠে, তবে তার ফল কি দাঁড়াবে? রাজনীতির সমস্যা, স্বাধীনতার সংগ্রাম সেই চিরন্তন আগুনের সঙ্গে লড়াই, তাই সে যুদ্ধে .দলে দলে শৃঙ্খলিত সংঘবদ্ধ শক্তি হিসাবে আমাদের লড়তে হবে। আকস্মিক প্লাবনের উন্মাদনায় তার মধ্যে ঝাঁপ দিলে আপাতসার্থকতা হয়তো মিলতে পারে, কিন্তু পরিণামে পরাজয় ও ধ্বংসের গ্লানি থেকে কেমন করে বাঁচব? আজ আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস আজ আমাদের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের ছাত্রশক্তি, যুবশক্তি, কৃষক এবং শ্রমিকের শক্তি চাই। সে উদ্দেশ্য আমাদের সফল হবেই, সার্থকতা আজ প্রায় আমাদের হাতের মুঠির মধ্যে এসে পড়েছে। আজ আমরা যারা এখানে রয়েছি, তারাও হয়তো সকলে কল্পনা করতে পারি নে যে সিদ্ধি আজ কতখানি আসন্ন। কিন্তু সিদ্ধি অনিবার্য্য এবং আসন্ন বলেই আজ আমাদের ভাবতে হবে, বুঝতে হবে যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্গেই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রকৃত সমস্যার সুরু।

আপনারা ছাত্র, ছাত্রজীবনের শেষে জীবনের কোন স্তরে কি

পর্য্যায়ে সমাজ সেবার সুযোগ আপনাদের মিলবে, সে কথা হয়তো আপনাদের মধ্যে অনেকে এখনই ভাবতে সুরু করেছেন। আপনারা ছাত্র, দেশের সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জীবনের সূত্রে গাঁথা। সে জীবনে যে গ্লানি, যে অপমান, যে হতাশা—তার কথা ভোলা কি আপনাদের পক্ষে সম্ভব? দেশের লোকের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, উত্তম নেই। হতাশ্বাস, নিরানন্দ, দুর্ব্বহ জীবনভার টেনে তাদের দিন কাটে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী তাদের চিরসঙ্গী। সে সমস্ত সমস্যা কি স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে হাজার গুণে তীব্র হয়ে উঠবে না? মানুষের স্বাধীনতার সমস্যা কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরাধীনতা দূর করেই মিটবে না, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহস্র অবিচার, সহস্র অত্যাচারের অবসানেই সে স্বাধীনতা মূর্ত্ত হয়ে উঠবে।

সেই স্বাধীনতার জন্য আজ আমাদের সংগ্রাম এবং সে সংগ্রামের সূত্রপাতও আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে। বিপ্লব চিরন্তন, চিরদিনই তরুণ নতুন নতুন বিদ্রোহে সমাজের সংগঠন বদলিয়ে দেবে, অভিজ্ঞতার সীমানাকে প্রসারিত করে জীবনকে সমৃদ্ধতর ও মহত্তর করে তুলবে। কিন্তু তরুণের সে বিদ্রোহকে যদি সার্থক করতে চাই, মানস সংগঠনের সে বিপ্লবকে কার্য্যকরী করাই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে বুদ্ধির মুক্তি ও স্বাধীনতার উপরই তার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভারতবর্ষে আমরা আবেগ দিয়েই বহু জিনিষ বিচার করি, বাংলা দেশে সে আবেগ-প্রবণতা আরো বেশী, কিন্তু অন্ধ আবেগ আবর্ত্তই সৃষ্টি করতে পারে, সংহত কর্ম্মপ্রেরণার শক্তি জাগানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্যই আমরা দেখেছি যে পরিমাণে দুঃখ-সাধনা আমরা করেছি, সে পরিমাণে ফল আমাদের মেলে নি।

স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে।

যে সমাজে আমাদের জন্ম, তার আচার, তার বিশ্বাস, তার রীতিনীতি ও সংস্কার অজ্ঞাতে, অনিচ্ছায় আমাদের রক্ত স্রোতের সঙ্গে জড়িত, আচ্ছন্ন চেতনার মধ্য দিয়ে আমাদের চিন্তায় তা আত্মপ্রকাশ করতে চায়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি তাই আমাদের মজ্জাগত, কিন্তু আজ বুদ্ধির বিশ্লেষণে এই কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতাই পৃথিবীর অধিকাংশ গ্লানির মূলে। ধনতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সম্বন্ধ স্পষ্ট। সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের গ্লানি ও অন্যায় সম্বন্ধে যাঁরা সজাগ, তারাও কি নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে সে ব্যক্তিসর্ব্বস্বতার বহুব্যাপী পরিণাম লক্ষ্য করেন? ধনিক সভ্যতার দিগ্বিজয়ের দিনে সে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতা কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে কথা হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন। ব্যক্তির স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র সেদিন দুর্ব্বলের প্রতি যে অত্যাচার দেখিয়েছে, সে কথা কি ভোলা যায়? ব্যক্তি মাত্রই স্বাধীন, তাই বারো বৎসরের কিশোর যদি কারখানায় রোজ ষোল ঘণ্টা করে খাটে, তবে সমাজ ও রাষ্ট্র তার কর্ম্মের স্বাধীনতায় বাধা দেবে কেন? ব্যক্তি মাত্রই স্বাধীন, তাই কারখানার মালিক যদি অন্ধকার ঘরে স্যাঁতসেতে মেজের উপর মজুরদের থাকবার জায়গা করে দেয়, তবেইবা মালিকের ব্যবস্থা করবার স্বাধীনতায় রাষ্ট্র বাধা দেবে কেন? আজ স্বাধীনতার সে বিড়ম্বনা ঘুচে গেছে, সংগঠনের নতুন আদর্শে আজ রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ-নির্ণয় কর্ত্তব্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু আমরা নিজেরা কি নিজেদের জীবনে সে সামঞ্জস্য করতে চেষ্টা করেছি? যে সভ্যতার আওতায় আমাদের জন্ম, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তার ফলে আমাদের স্বভাব। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় দাবীকে আমরা কি

আমাদের স্বভাবের অন্তর্গত করে নিয়েছি? যে সব বিভিন্ন সমাজের সমাবেশে দেশের রাষ্ট্র, সেই সমস্ত সমাজের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করবার চেষ্টা আমরা কি করি? এক কথায় সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রকে বোঝবার চেষ্টা আমাদের কতখানি সার্থক? ব্যক্তিগত জীবনে যদি আমরা এ সমস্যার সমাধান করতে না পারি, তবে পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, দেশের স্বাধীনতা ও সভ্যতার সংগ্রামেও আমাদের যোগদান স্বপ্নবিলাস হয়ে দাঁড়াবে।

আমি অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছি যে ভারতবর্ষে আমাদের মনোবৃত্তি ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে বড় জোর পরিবার পর্য্যন্ত আজ এগিয়েছে সামাজিক বোধের আমাদের যত অভাব, একমাত্র চীনে ছাড়া আর কোন সভ্যতাভিমানী জাতির মধ্যেই বোধ হয় তার নমুনা মেলে না। চীনেও সামাজিক বোধ এক হিসেবে আমাদের চেয়ে বেশী—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় ও প্রীতিস্থাপন করতে তাঁরা পেরেছেন। বুদ্ধির সার্ব্বিকতা ও সার্ব্বজনীনতার মধ্যে আমরা আমাদের সমাজবোধকে আজও উদ্বুদ্ধ করতে পারিনি বলেই আজও আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্ভবপর। ব্যক্তিত্ববোধ ও গোষ্ঠী-প্রীতির প্রাবল্যে তাই সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের কথা আমরা ভুলে যাই। ছাত্র জীবনে আমাদের সর্ব্বপ্রথম সাধনা হোক এই গোষ্ঠীবোধকে অতিক্রম করে নতুন জাতীয়তা, নতুন মানবতার ভিত্তিস্থাপন।

স্বাধীনতা ও সংগঠনের এ সংঘর্ষ কেবলমাত্র ব্যক্তির জীবনেই আজ প্রবল নয়—মনোবৃত্তির সে বিপ্লব আজ পৃথিবীর সমস্ত সমস্যাকেই নতুন রূপ দিয়েছে। উগ্র জাতীয়তার যুগ গত শতকে আমরা দেখেছি। জাতির স্বাধীনতার নামে সেখানে চলেছে প্রবলের স্বেচ্ছাচার এবং তুর্ব্বলের বিড়ম্বনা। আজ মানুষের চিত্ত, মানুষের বুদ্ধি তারও বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, সমস্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও আদর্শগত ঐক্যকে স্বীকার করে রাজনৈতিক সম্পর্ককে নতুন রূপ দিবার চেষ্টা চলেছে। আজ আমরা শিখেছি যে ইংরাজ ভারতে যে সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তুলেছে, তার প্রভাব কেবলমাত্র ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা। বিলেতে ইংরেজের নিজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক, জীবনও তাতে বিষিয়ে উঠছে। আজ আমরা বুঝেছি যে ভারতবর্ষের যে কেবলমাত্র নিজের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সমাহিত হয়ে থাকবার চেষ্টা, বর্তমান জগতের পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে অতীতের স্বপ্নবিলাসে নিজেকে ভোলাবার প্রয়াস, তাতে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেরই ক্ষতি নয়, ইয়োরোপের উদ্যত সংগ্রামশীল মনোবৃত্তির উপরেও সেই জড়ত্বের ছায়া পড়ে। দুনিয়ার ঐক্য, মানুষের ভ্রাতৃত্ব তাই আজ আর স্বপ্ন বা আদর্শমাত্র নয়, তারই বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে আজ আমাদের নতুন ভারতবর্ষ, নতুন বিশ্বসমাজের পরিকল্পনা করতে হবে।

ছাত্র আন্দোলন সেই বিশ্বব্যাপী বুদ্ধির স্বাধীনতার বিদ্রোহের বিশিষ্ট রূপ। যে স্বাধীনতা ছাত্র আন্দোলন আপনাদের জীবনে এনে দেবে, যে সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ তার ফলে আপনাদের স্বভাবে মজ্জাগত হয়ে উঠবে, যে সংহতি ও একতার মধ্যে সেই স্বাধীনতা ও ও সংগঠনের আপনারা সমন্বয় খুঁজবেন, সে সমন্বয় আজ সমস্ত পৃথিবীর সাধনা। ছাত্র আন্দোলনের অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরের মধ্যে যদি আমরা তার ভূমিকার পরিচয় পাই, তবেই ছাত্র আন্দোলন সার্থক ও সুন্দর।

হাওড়া ছাত্র সম্মেলন, শ্রাবণ ১৩৪৫

শিক্ষা ও শিক্ষক

আজ শিক্ষার আদর্শ এবং ধারা নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি এবং দেই, বর্ত্তমানে আমাদের জীবনের সমস্ত দাবি যে সে শিক্ষা মেটাতে পারছে না একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এক কালে বিদেশী রাজশক্তির নিজের কাজের স্থবিধার জন্য এ শিক্ষার পত্তন হয়, তাই দেশে সেদিন যে প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল, তাকে অকস্মাৎ পালটে দেওয়া হল। পুরনো বলেই তা খারাপ, এমন ধারণাও সেদিন অনেকের মনে খেলেছে। অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন যে এক আলমারী বিলিতী বই সমস্ত আরবী-ফারসী-সংস্কৃত বইয়ের চেয়ে মূল্যবান বেশী। পুরনোকে বাদ দিলে ততটা ক্ষতি হত না, যদি তার বদলে দেশের প্রয়োজনের তাগিদে নতুন শিক্ষারীতি গড়ে উঠত। সেদিন কিন্তু তা হয়নি। দেশের কথা ভুলে গিয়ে মুষ্টিমেয় বিদেশীর শাসন এবং শোষণের স্থবিধার কথা বিচার করেই সেদিন হয়েছিল শিক্ষার পত্তন, এবং সেজন্য নীচে থেকে শিক্ষার ধারা গড়ে না উঠে উপর থেকে তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতেও হয়তো বিপদ এতটা হত না, কারণ অশথ গাছের শেকড় উপর থেকে নামলেও মাটীতে এসে তা রস পায়, কিন্তু যে নতুন শিক্ষার ধারা এদেশে গড়ে উঠল, তার গুঁড়িতো ছিলই না, এমন কি শূন্য থেকেও তার শেকড় এসে মাটীতে পৌঁছল না।

ইংরেজের সেদিন প্রয়োজন হয়েছিল কেরাণীর। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজকার্য্য চালাতে উচ্চতন ইংরেজ বণিক ও কর্ম্মচারীকে

সাহায্য করতে পারবে। তার জন্য চাই ভাষায় খানিক নিপুণতা। বুদ্ধির বিকাশের কোন প্রয়োজন সেখানে নেই। চিন্তা করতে গেলেই নানা কথা মনে আসে, তার মধ্যে সন্দেহ সংশয় এবং প্রশ্নেরও অবকাশ বহু। তাই সেদিন যে শিক্ষার পত্তন হয়েছিল, বুদ্ধির বিকাশ বা চিন্তার স্বাধীনতার চেয়ে ভাষাতত্ত্ব এবং তথ্যজ্ঞানের দিকেই ছিল তার লক্ষ্য। সে শিক্ষা তাই প্রশ্ন করতে শেখায় নি, নিষ্প্রশ্ন নির্ব্বিবাদে আদেশ পালনের মনোবৃত্তি রচনা করেই তৃপ্ত হয়েছে। সেজন্যই আমাদের দেশে অক্ষর জ্ঞানের বিস্তার যতটা বেড়েছে, শিক্ষিত অনুসন্ধিৎসু মনের সংখ্যা ততটা বাড়ে নি।

বহুদিন শিক্ষার এ গোড়ার গলদ ধরা পড়েনি, কারণ শিক্ষার লক্ষ্য ছিল চাকুরী এবং শিক্ষার ফলে চাকুরী ছিল সহজলভ্য। কিন্তু চাকুরীর সহজলভ্যতায়ই সে শিক্ষার গলদ বেরিয়ে পড়ল, কারণ একদিকে শিল্প-বাণিজ্যের বিনাশ এবং অন্যদিকে যাতায়াতের সৌকর্য্যে চাকুরী-আকাঙ্ক্ষীর দল এত বেড়ে গেল যে চাকুরী হয়ে উঠল দুর্লভ এবং শিক্ষার্থীর দল দেখল যে চাকুরী ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। আজ দিন দিন সেই গলদ হয়ে উঠছে স্পষ্টতর। শিক্ষিত বেকারের দল তিক্ত অভিজ্ঞতায় শিখছে যে তাদের শিক্ষা তাদের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ করে নি, কেবলমাত্র তাদের কর্ম্মমুখিনতাকে সঙ্কুচিতই করেছে।

আজ তাই এ শিক্ষার বিরুদ্ধে এসেছে বিদ্রোহ এবং সে বিদ্রোহের ফলে শিক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধেই উঠছে প্রশ্ন এবং সন্দেহ। বর্ত্তমানে যে সাম্প্রদায়িকতার প্রবল বন্যা দেশে নেমেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বর্ত্তমানের শিক্ষা প্রণালীও তার জন্য অনেকটা দায়ী। একদিকে চাকুরী তার একমাত্র লক্ষ্য বলে চাকুরীর সুবিধার জন্য সাম্প্রদায়িক কোলাহল এবং অন্যপক্ষে এ শিক্ষার ব্যর্থতা বোধে পুরাতনের প্রতি

নতুন মোহ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরনো আচার-পদ্ধতির অন্ধ পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা জীবনসংগ্রামকে এ দেশে আরো ঘোরালো করে তুলেছে।

সময়ের প্রবাহকে কিন্তু ফেরানো যায় না, তাই একশো বছর আগে যে শিক্ষাপ্রণালী অকস্মাৎ বর্জ্জিত হয়েছিল, আজ তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। তখনকার দিনে হয়তো তাই ছিল উপযোগী। কিন্তু আজ তার সে সার্থকতা নেই। আজ আবার সেই শিক্ষার ধারাকে জাগাবার চেষ্টায় জাতি পিছিয়ে পড়বে। অন্যপক্ষে চাকুরীসর্ব্বস্ব প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর নিজের মধ্যেই যে বিরোধ, তা দূর করলে কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক কলহের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান মিলবে না। হিন্দু সম্প্রদায় তো প্রায় একশো বছর চাকুরীর ষোল আনা না হলেও পনেরো আনা ভোগ করেছে, তবু আজ তাদের মধ্যেই বেকারের সংখ্যা বেশী এবং এ অবস্থার জন্য মুসলমান উমেদার দায়ী নয়। কারণ যদি আজ একজনও মুসলমান চাকুরে বা উমেদার না থাকত, তবু কেবলমাত্র হিন্দু প্রার্থীদের প্রাচুর্য্যে দেশে বেকারের সমস্যা তীব্র হয়ে উঠত। ঠিক তেমনি আজ যদি হিন্দুকে চাকুরী দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়, তা হলেও দুচার বছরের মধ্যে মুসলমান উমেদারের সংখ্যা এত বেড়ে যাবে যে তাদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনকেও চাকুরী দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

তাই সাম্প্রদায়িক কলহে বেকার সমস্যা মিটবে না। বেকার-সমস্যা মেটাবার একমাত্র উপায় দেশে শিল্প-বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, শিক্ষার ধারা ও রীতিনীতি বদলে নূতন সমাজ-সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন। বেকার সমস্যার তীব্রতাই শিক্ষার ধারার দিকে আমাদের দৃষ্টি টেনেছে, অথচ শিক্ষার লক্ষ্য-ভ্রান্তিই যে বেকার-সমস্যার অন্যতম কারণ, সে কথা

আমরা ভুলে যাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ, শিক্ষার লক্ষ্য সামাজিক মন সংগঠন। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তি, তাই এ দুটো লক্ষ্য পরস্পর বিচ্যুত নয়। একই লক্ষ্যের দুটি বিভিন্ন দিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং সমাজ সংগঠন। তার জন্য চাই বুদ্ধির মুক্তি, তার জন্য চাই সমাজের সমন্বয় ও সঙ্গতি। অথচ আজ পৃথিবীতে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বই পদে পদে চোখে পড়ে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বহুর স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়ে মুষ্টিমেয়র স্বার্থসিদ্ধি, অর্থনীতির ক্ষেত্রে লক্ষ লোকের অনাহার এবং বস্ত্রহীনতার উপরে মুষ্টিমেয় ধনিকের সম্পদ। হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার, অথচ আমাদের দেশে শতকরা নব্বই জন নিরক্ষর। এক কথায় যে স্বেচ্ছাচারী নৈরাজ্য আজ সমাজে চলছে, তার রূপান্তর না ঘটলে শিক্ষার পূর্ণতাও ঘটতে পারে না।

সে রূপান্তর আনতে পারে শিক্ষক এবং শিক্ষা। তার জন্য চাই শিক্ষারও রূপান্তর। চাকুরীসর্ব্বস্ব যে শিক্ষা এতদিন কেবল আদেশ পালন করতেই আমাদের শিখিয়েছে, মনের সজীবতার বদলে দিয়েছে মনের বার্দ্ধক্য, তার বদলে চাই এমন শিক্ষার আদর্শ যার ফলে মনের প্রশ্ন আর মিটবে না, নিত্য নূতন জিজ্ঞাসায় ব্যক্তি এবং সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলে উঠবে। চাই এমন শিক্ষা যার ফলে থাকবে দেহের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য, মনের সজীবতার সঙ্গী হবে দেহের সক্রিয়তা। আমাদের দেশের পুঁথিগত শিক্ষায় করকৌশলের বিকাশ হয় না, অথচ ইয়োরোপের সমস্ত স্বাধীন দেশেই প্রাথমিক শিক্ষায় করকৌশলের উপর ঝোঁক বেশী। সেজন্যই দেখা যায় যে ইয়োরোপের শিক্ষিত লোকের ব্যবহারিক দক্ষতা আমাদের চেয়ে বেশী, তারই ফলে তাদের দেশে যন্ত্র-শিল্পের এতখানি প্রসার সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষায় আজ চাই এমন রূপান্তর যার ফলে শিক্ষার্থীর মনে আসবে

প্রশ্ন, হাতে আসবে কৌশল। বিদ্রোহী মন এবং সক্রিয় হাত কেবল যে ব্যবহারিক জীবনে তাদের সার্থকতা দেবে তা নয়, চিন্তাজগতে এবং সমাজ সংগঠনের ধারণায়ও আনবে বিপ্লব। ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার বিস্তৃত আলোচনা না করেও এটুকু বলা চলে যে জাকির হোসেন কমিটি প্রাথমিক শিক্ষায় হাতের কৌশল এবং সক্রিয় মনের উপর যে ঝোঁক দিয়েছে, তার মধ্যে বিপ্লবকর সম্ভাবনা রয়েছে। মুহম্মদ ইক্‌বাল শিক্ষাধারার যে রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারও মূলকথা বিদ্রোহী মন এবং সক্রিয় হাত।

সমাজ সংগঠনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকেরও অনেক অভাব, অনেক অভিযোগ ঘুচবে। শিক্ষক আজ সমাজে অনাদৃত। সমাজকে শিক্ষাদান করেও সমাজে তার স্থান নেই বললেই চলে। তার একটা কারণ আমাদের জড় বস্তুতান্ত্রিক মন। পাঁচ মন ধান যদি কেউ দান করে, তবে তাকে আমরা বলি দাতা, কিন্তু সমস্ত জীবন যার শিক্ষাদান ব্রত, তার দান আমরা স্বীকার করিনে। আর একটি কারণ যে আমাদের সমাজে অর্থ দিয়েই আমরা সামাজিক মর্য্যাদার বিচার করি। সমস্ত দেশেই চিরদিন শিক্ষক অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, তাই সমাজে তার মর্য্যাদার উপযুক্ত স্বীকার হয় না। কিন্তু শিক্ষকের অমর্য্যাদার সব চেয়ে বড় কারণ শিক্ষকের নিজের অমর্যাদা। শিক্ষক দরিদ্র হয়েও উন্নত থাকতে পারেন, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই তার নিজের মনের ক্ষুদ্রতায় তিনি সমাজের চোখে নিজেকে ছোট করে ফেলেন। সমাজ সংগঠনের যদি পরিবর্ত্তন হয়, তবে আর্থিক বৈষম্য দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের অমর্য্যাদার একটা প্রধান কারণ ঘুচে যাবে। আজও আমাদের দেশের মতন আর্থিক অসাম্য পৃথিবীর কোথাও বোধ হয় নাই। আমাদের দেশে মাসে পাঁচ টাকা বেতনের শিক্ষকও আছেন, আবার আমাদের

দেশে মাসে দুই তিন হাজার টাকা বেতন ও মুনাফার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও দেখা যায়। বিলেতে এত বেশী বৈষম্য নেই, সেখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় যে কনেষ্টবল, সে পায় দুশো আড়াইশো টাকা মাসে অথচ সমস্ত ইংলণ্ডের পুলিশের বড় কর্ত্তারও বেতন মাসে হাজার বারোশোর বেশী নয়।

সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের নিজের মনে আনতে হবে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, নিজের কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা। ফরাসী দেশে মাস্টারের বেতন খুবই কম সেখানে মাসে ৫০।৬০ টাকায় শিক্ষকের কাজ সুরু। অথচ ফরাসী শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা লোভনীয়। তার প্রধান কারণ এই যে সেখানে ৭।১৮ বৎসরেই শিক্ষাব্রত সম্বন্ধে মন স্থির করতেই হয়, এবং সমগ্র দেশব্যাপী পরীক্ষার ফলে শিক্ষক সংগ্রহে শিক্ষকের বিদ্যা-বুদ্ধি এবং আদর্শপ্রীতির বিষয়ে লোকের মনে সন্দেহ থাকে না। আমাদের দেশে আজ বহুক্ষেত্রেই সমস্ত চেষ্টায় বঞ্চিত এবং হতাশই গ্রহণ করে শিক্ষাবৃত্তি, তাই তার নিজেরও মনে থাকে না আত্মপ্রত্যয়, সমাজেরও নাই তার প্রতি শ্রদ্ধা যদি আমাদের দেশেও অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে দশ বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে মনস্থির করার ব্যবস্থা হয়, তবে অর্থের স্বল্পতা সত্ত্বেও শিক্ষক সাধারণের শ্রদ্ধা পাবেন।

আজ শিক্ষককে আবার নিজের সামাজিক সত্ত্বা এবং শিক্ষার আদর্শের কথা নতুন করে ভাবতে হবে। সামাজিক সংগঠন আজ এমন ভাবে বদলানো চাই যে কারো ভাগে বিলাসের প্রাচুর্য্য এবং কারো ভাগে যেন প্রয়োজনের দুর্ভিক্ষ না ঘটে। মানস এবং সমাজ-জগতে সে বিপ্লব আনবার শক্তি এবং পথনির্দ্দেশ আজ শিক্ষা এবং শিক্ষকের একমাত্র সমস্যা।

ঢাকা শিক্ষা সম্মেলন, মাঘ ১৩৪৫

সমাজ ও প্রাথমিক শিক্ষক

বর্তমানের শিক্ষা প্রণালীর গলদের অনেক আলোচনা হয়েছে। বিদেশীর শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষাধারা মানুষের চিত্তকে বিকশিত না করে অন্তরকে কেবলমাত্র ভারাক্রান্ত করেছে। বুদ্ধির মুক্তিসাধনের লক্ষ্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে বিদ্যার গুরুভারে স্বাধীন চিন্তাকে পর্য্যন্ত এ শিক্ষা কি ভাবে নিষ্পেষিত করেছে, সে বিষয়েও আজ সন্দেহ নেই। বিদেশীর সুবিধার জন্য বিজাতীয় ভাষাকে কেবলমাত্র শিক্ষার বাহন করেই তা ক্ষান্ত হয়নি, শিক্ষার বাহনই হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষার লক্ষ্য। উদ্দেশ্য ও উপায়ের বিভ্রান্তির ফলে যে কেবল পদে পদে শিক্ষারই পরাজয় হয়েছে, তা নয়; সমাজ সত্ত্বার উপরেও তার ক্ষতিকর প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এক কথায় বিদেশী শাসকের আদেশ পালন করবার জন্য যে ভাষাগত বুৎপত্তি, তাকেই শিক্ষার লক্ষ্য মনে করে এ শিক্ষা পদে পদে নিজেকেই পরাজিত করেছে।

এ সমস্ত কথা বহুবার আলোচিত হয়েছে। আমিও নিজের সাধ্যমত এসব কথা অনেকবার বলতে চেষ্টা করেছি। আজ সে কথার পুনরাবৃত্তি না করে এ শিক্ষার ফলে সমাজসত্ত্বা কি ভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়েছে, সে সম্বন্ধেই দুই একটী কথা বলতে চাই। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী আদেশ পালন করতে শেখায়, আদেশ দিতে শেখায় না এবং তার ফলে জাতীয় চরিত্রের ভিত্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। সাময়িক মনে করে সে

দুর্ব্বলতাকেও হয়তো ক্ষমা করা চলত, কারণ এ শিক্ষার ফলে প্রাচীন বিশ্বাসের ভিত্তি টলে ওঠে, সংস্কারের অচলায়তনের প্রাচীরে ফাঁক দেখা দেয়। ভবিষ্যৎ বিপ্লবের বাহন হিসাবে তাই এ শিক্ষাকেও হয়তো সমাদর করা চলত, কিন্তু সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের যোগসূত্রকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করায় এ শিক্ষার বিপ্লবী সার্থকতাও গৌণ। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে এ শিক্ষা যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছে, বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর সব চেয়ে বড় গলদ সেইখানে।

রাষ্ট্রিক ও আর্থিক দাসত্বের ফলে আজ আমাদের দেশ নির্জ্জীব ও প্রাণহীন। ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সম্বন্ধের ইতিহাস যিনিই আলোচনা করেছেন, তিনিই জানেন যে কি ভাবে ইংলণ্ডের অর্থসম্পদ বাড়াবার জন্য ভারতবর্ষের লোকের জীবিকা অপহৃত হয়েছে। নিরন্ন ও বস্ত্রহীন ভারতবাসীর ক্ষুধা ও নগ্নতার ভিত্তিতেই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সমৃদ্ধি ও কৃষ্টি, কিন্তু সে ভিত্তিকে ধূলিস্বাৎ করে নূতন ভারতীয় সভ্যতার গোড়া পত্তনের জন্য যে শক্তি, জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টা ভিন্ন তা কোথায় থেকে মিলবে? জনগণের মধ্যে শক্তির বিপুল উৎস, অত্যাচার ও বঞ্চনার বাঁধ দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা চলে না, বরঞ্চ নদীর স্রোত-ধারাকে বাঁধতে চাইলে তার শক্তি যেমন আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, দুঃখ এবং অনাহারে জনশক্তিও তেমনি ভাবে আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। শক্তি চিরদিনই অন্ধ। উন্মত্ত আবেগে বাধার সামনে যেমন আপনাকে উৎক্ষেপিত করতে পারে, কৌশলে তেমনি ভাবে সে শক্তিকে বাধা রচনার কার্য্যেও নিয়োগ করা চলে। ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য যে এদেশের বিপুল জনশক্তি দিকভ্রান্ত হয়ে নিত্য নূতন বাধাই সৃষ্টি

করে চলেছে, এখন পর্যন্ত বাধা বন্ধন চূর্ণ করে আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক স্বাধীনতা স্থাপনে আত্মনিয়োগ করেনি।

পূর্ব্বেই বলেছি যে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর সব চেয়ে বড় গলদ এইখানে। সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে নাড়ীর যোগ পর্য্যন্ত লুপ্ত করে এ শিক্ষা তথাকথিত শিক্ষিতকে করেছে কর্ম্মবিমুখ, স্বপ্নবিলাসী ও শক্তিহীন, বিপুল জনসাধারণকে করেছে চিন্তাহীন, লক্ষ্যহারা ও আত্মদ্রোহী। ফলে সমাজের উভয় অঙ্গই হয়ে পড়েছে অকর্ম্মণ্য ও জড়ধর্ম্মী। আর্থিক প্রতিষ্ঠার প্রতি অন্ধ মোহ ও কেবলমাত্র উপার্জ্জনের মাপকাটিতে মানুষের মর্য্যাদা বিচারের প্রবৃত্তি তাই আমাদের সামাজিক আদর্শকে বিকৃত করেছে, এবং জ্ঞানশক্তি ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান দিন দিন বাড়িয়ে চলেছে।

সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব কলহ আজ ভারতবর্ষে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তারও মূলে রাষ্ট্রিক ও আর্থিক পরাধীনতা এবং শিক্ষার লক্ষ্যচ্যুতি। অন্যত্র বিশদতর ভাবে এ সমস্ত সমস্যা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি, আজ শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, আজ অন্ধ জনশক্তির দিকভ্রান্তি যদি সাম্প্রদায়িকতায় আত্মপ্রকাশ করে তবে তাতে বিচিত্র কি? মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায় সর্বত্রই জনশক্তির ব্যবহারে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে। জ্ঞানশক্তির লক্ষ্য নির্দ্দেশ ও জনশক্তির সে লক্ষ্যসাধন, পৃথিবীর বহুদেশেই সামাজিক বিপ্লব ও প্রগতির এই ইতিহাস। ভারতবর্ষে তাদের মধ্যে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন। তাই জ্ঞানশক্তি কেবলমাত্র আত্মকেন্দ্রিক আবর্ত্তনের মধ্যে আবদ্ধ এবং বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হতাশা ও আত্ম-অবিশ্বাস। জনশক্তি লক্ষ্যহারা হয়ে অন্ধ আবেগে প্রতিক্রিয়াশীল, এবং সেই প্রতিক্রিয়ারই স্বাভাবিক বিকাশ সাম্প্রদায়িকতা।

ইংরেজের সাম্রাজ্যনীতি এ সাম্প্রদায়িকতাকে কি ভাবে পদে পদে সাহায্য করেছে, সে কথার বিস্তারিত আলোচনা বহুবার হয়েছে। সাম্রাজ্যিক সেই ভেদনীতিই বাংলাদেশে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে এ ব্যবধানকে বাড়িয়ে তুলেছে। ইংরেজের দেওয়ানি লাভের পূর্ব্বে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপযোগী শিক্ষা-প্রণালীর ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদও ছিল না। সমাজের প্রত্যেক স্তরে হিন্দু এবং মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় সেদিন তাই সামাজিক জীবন ছিল সহজ ও সুস্থ। দেওয়ানি লাভের ঠিক পরেই ইংরেজ মুসলমান শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য করবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, বাংলার ইতিহাস নিয়ে যাঁরাই আলোচনা করেন, তাঁদের সে কথা জানা আছে —যদিও স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে সে সমস্ত কথা বিলোপ ও বিকৃত করবার প্রবল প্রয়াস হয়েছে। চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তের মূলেও এ রাজনৈতিক কারণ সক্রিয়। লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থারও লক্ষ্য এইদিকে। মেকলে প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-নীতির বিপ্লবও ইংরেজের এ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথ এবং ঠিক সেই কারণেই সে শিক্ষানীতি আজ আমাদের সমাজে এত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে।

এ সমস্ত ব্যবস্থার ফলে দাঁড়িয়েছিল যে প্রধানত হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই শিক্ষিত এবং বাংলার বাকী সমস্ত সম্প্রদায়ই অশিক্ষিত। শিক্ষার ধারাও বিদেশাভিমুখী ও অর্থকরী, তাই শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান দিন দিন বেড়ে চলল, তার সঙ্গে যোগ দিল সাম্প্রদায়িক ভেদ। বাংলার বিপুল জনশক্তি আজ পর্য্যন্ত যে রাষ্ট্রিক ও আর্থিক অধিকার লাভের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনে পুরোপুরি

যোগ দেয়নি, তারও কারণ এই সাম্প্রদায়িক ও কৃষ্টিগত ভেদ। যেখানেই সে ভেদ অপেক্ষাকৃত কম, সেখানেই রাজনৈতিক আন্দোলন অধিকতর সার্থক। ত্রিপুরা বা মেদিনীপুরে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ কম বলেই সে সমস্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রিক সংগ্রাম সক্রিয় ও শক্তিশালী। বাংলার অন্যত্র সে পার্থক্যের ফলেই রাজনৈতিক সংগ্রামে বেগ আসে নি। তার বদলে জেগেছে সাম্প্রদায়িক কলহের আবর্ত্ত।

দেশের বিপুল জনশক্তিকে সংহত, সুসংবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করা আজ আমাদের জাতীয় জীবনের মহত্তম সমস্যা। রাষ্ট্রিক অধিকার ভিন্ন অর্থনৈতিক সংগঠন অসম্ভব, এবং অর্থনৈতিক বিপ্লব ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার গ্লানি দূর হবে না, এ বিষয়ে আজ কোন মতভেদ নেই। সেই রাষ্ট্রিক অধিকার অর্জ্জনের একমাত্র অস্ত্র জনশক্তির সংহত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং তার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানশক্তির ও জনশক্তির মধ্যে কৃষ্টিগত ও সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের বিলোপ। ঘটনার বিবর্ত্তনে আজ শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে কৃষ্টিগত এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ বিলোপমান, এবং সে বিভেদ যত সত্বর বিলুপ্ত হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। সে পার্থক্য-লোপে রাজশক্তির ব্যবহারে সাময়িক অন্যায় ও অসন্তোষ সৃষ্টি অসম্ভব নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আজ তাকে ব্যবহার না করে উপায় নেই।

বিপদ কিন্তু সেখানে নয়। বিপদ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন কৃষ্টিগত পাথক্য সৃষ্টি, এবং তার ফলে দেশের বিপ্লবী জনশক্তিকে রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে ব্যবহার না করে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের মধ্যে তার আত্মহত্যার চেষ্টা। সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আজ শিক্ষার দ্রুত বিস্তারে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের পার্থক্য কমে এসেছে, শিক্ষার

সাম্প্রদায়িক বণ্টনও মিলিয়ে আসছে, এবং তার ফলে আজ দেশের রাষ্ট্রিক মুক্তিসংগ্রামে বিপুল জনশক্তিকে ব্যবহার করবার সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের আশঙ্কাও সেইখানে। আজ তাই তাদের চেষ্টা নতুন স্তরে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সৃষ্ট নতুন সংস্কৃতির বিভাগে সে শক্তিকে দ্বিখণ্ডিত করা।

ভারতবর্ষের হাজার বৎসরের কৃষ্টির ইতিহাস মুসলমান ও হিন্দুর যুগ্মসাধনা! সাহিত্য, শিল্প, আচার, ব্যবহার, ভাষা, সংস্কৃতিতে পদে পদে তার পরিচয়। তাদের ভাষা এক। হাজার বৎসরের রক্তের অদল বদলে জাতিগত পার্থক্য পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে একাকার হয়ে গেছে। শঙ্কর দর্শনকে হিন্দুত্বের চরম বিকাশ বলে ধরা হয়। অথচ আজ তারও মধ্যে মুসলিম চিন্তাধারার প্রভাব অনস্বীকার্য্য ভাবে ধরা পড়েছে। সুফীমতবাদে ও বিশেষ করে জালালুদ্দিন রুমীর কাব্যধারায় মুসলিম কৃষ্টির পরাকাষ্ঠা, অথচ উভয়ের মধ্যেই অবিচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে রয়েছে হিন্দুর দার্শনিক চিন্তা। উত্তর ভারতে হিন্দুর মন্দির নির্ম্মাণেও মুসলিম রীতির প্রভাব, মুসলমানের মসজিদের ভারতীয় বিকাশেও হিন্দু স্থপতির ছায়া। হিন্দুর নামে মুসলমানের প্রভাব, মুসলমানের পোষাকে হিন্দুর দান। এমনি ভাবে জীবনের প্রতি স্তরে হিন্দু এবং মুসলমানের সাধনা ভারতবর্ষের সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে, আমাদের জীবনকেও তারই মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

বর্ত্তমানে জনশক্তির জাগরণের যে সম্ভাবনা এবং তার ফলে আসন্ন বিপ্লবে রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠনের যে আমূল বিবর্ত্তন আসন্ন তাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য আজ তাই কায়েমী স্বার্থবাদীদের মুখে নতুন বুলি। ভারতীয় কৃষ্টিকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারলে কেবল

যে জনগণ বিভ্রান্ত হবে তা নয়! কৃষ্টির দ্বন্দ্বকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে আসন্ন বিপ্লবকে পরাজিত করার মন্ত্রও হয় তো তার মধ্যে মিলতে পারে। সাম্প্রদায়িক নেতারাই উভয় ক্ষেত্রে দোষী, এবং তার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের যে সম্ভাবনা উঠতে পারে দেশের পক্ষে তা আত্মঘাতী।

জাকির হোসেন কমিটির পরিকল্পনায় যে ওয়ার্দ্ধা স্কীম রচিত হয়, তার মধ্যে কল্যাণকর সম্ভাবনা প্রচুর। দেশের শিল্প বাণিজ্য লোপের রাষ্ট্রিক কারণ সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু করকৌশলের সঙ্গে সক্রিয় মনের বিয়োগও যে তার অন্যতম কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতদিন দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকেও পুঁথিসর্ব্বস্ব করে রাখবার অর্থ এই যে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ছিল একমাত্র অর্থকরী। এবং অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যর্থতার ফলে সে শিক্ষা প্রণালীর প্রতি লোকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। প্রাথমিক শিক্ষকের দুর্গতির অন্যতম কারণও এইখানেই মেলে। কারণ সমাজ যার শ্রমের মর্য্যাদা দেয় না, তার শ্রমকে অর্থকরী সার্থকতাই বা দেবে কেন? ওয়ার্দ্ধা স্কীমে প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বকেন্দ্রিক ও স্বাবলম্বী করবার পরিকল্পনা তাই বিপ্লবকারী। অধ্যয়নসর্ব্বস্ব প্রাথমিক শিক্ষাকে বদলে শিল্পশিক্ষার প্রতি ঝোঁক এবং তার ফলে সক্রিয় মনের সঙ্গে করকৌশলের নতুন সমন্বয় সাধন সম্ভবপর কিনা, এই দিক থেকেই তার বিচার করতে হবে। অনেক শিক্ষাবিদেরই বিশ্বাস যে এভাবেই ব্যক্তিত্বেও বিকাশ পূর্ণতর হয়। সক্রিয় মন ও কুশলী হাতের মধ্যে যোগস্থাপনের উদ্দেশ্যেই শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে তাঁদের নতুন নতুন পরিকল্পনা।

প্রাথমিক শিক্ষকের অর্থ সমস্যার দিক থেকেও এ রকমের পরিকল্পনার সার্থকতার আভাস রয়েছে। কিন্তু এর এত গুণ সত্ত্বেও

ওয়ার্দ্ধা স্কীম ভারতীয় মুসলমানের এক বিপুল অংশের মন আকর্ষণ করতে পারেনি।

মধ্যপ্রদেশের প্রস্তাবিত বিদ্যামন্দির স্কীম যে এ বিরাগের জন্য অনেকখানি দায়ী, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। যে দেশেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস, সেখানেই রাজকীয় শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে পার্থিব এবং ধর্ম্মনিরপেক্ষ না করলে সমস্যাসৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে গেলেই গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ছায়া শিক্ষায় পড়বে এবং লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেই। কামাল আতাতুর্ক একথা বুঝেছিলেন বলেই তুরস্কের শিক্ষারীতি ধর্ম্মনিরপেক্ষ ও পার্থিব এবং সেজন্য তুরস্কে সাম্প্রদায়িক সমস্যা আজ নেই। কামাল আতাতুর্কের নাম আমরা প্রায়ই করে থাকি, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার ভাণও করি। কিন্তু তাঁর অনুসৃত কর্ম্মপন্থা গ্রহণে আমাদের এত অনিচ্ছা কেন? বিদ্যামন্দিরের বিরুদ্ধে মুসলমানের বিদ্রোহ জাগানো সহজ। যদি বিদ্যামন্দির নামের কোন সার্থকতা থাকে, তবে তার ধর্ম্মীয় পক্ষপাত স্পষ্ট। যদি ধর্ম্মীয় কোন পক্ষপাত না থাকবে, তবে নামের প্রতি এত মোহ কেন? ফলে বিদ্যামন্দির নামে আপত্তি হয়ে দাঁড়ালো ওয়ার্দ্ধা স্কীমের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। এ পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার উন্নতির যে বিপ্লবকর সম্ভাবনা ছিল সে কথা একেবারে চাপা পড়ে গেল।

বর্ত্তমানে যাঁরা শিক্ষার সাম্প্রদায়িক বিভেদের উপর ঝোঁক দিতে চান, তাঁরা সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে সাম্রাজ্যবাদী এবং কায়েমী স্বার্থবাদীর সহায়ক। জনশক্তির মিলিত চেষ্টা ভিন্ন রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব অসম্ভব এবং আজ জনশক্তির সে মিলিত চেষ্টাকে রোধ করবার একমাত্র অস্ত্র সাম্প্রদায়িক ভেদ ও বিভাগ সৃষ্টি। তাই

প্রাথমিক শিক্ষক আজ দেশের ভবিষ্যতের নিয়ামক, কারণ জনশক্তিকে সংহত, সংবুদ্ধ ও সক্রিয় করবার শক্তি এবং সুযোগ তাঁদের হাতে। কেবলমাত্র তাঁরাই জ্ঞানশক্তি ও জনশক্তির মধ্যে যোগস্থাপন করবার অধিকারী, কেবলমাত্র তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধারায় যে জনশক্তি বর্ত্তমানে বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল, তাদের একত্রিত করে নতুন সমাজ ব্যবস্থা রচনা সম্ভবপর।

প্রাথমিক শিক্ষকের আর্থিক দুর্গতির কথা আজ আর বলব না। সমাজ ব্যবস্থার গোড়ায় যে গলদ, সে গলদ দূর করতে না পারলে তাঁর অবস্থা ফিরবে না। অনাহারে, বস্ত্রহীনতায়, অত্যাচারের জর্জ্জরতায় যে বিপুল জনসাধারণের তাঁরা শিক্ষাদাতা ও নেতা, তার সঙ্গে তাঁদের একই অবস্থা। তাদের অভাব অভিযোগের ও দুঃখকষ্টের সাথী বলেই তো প্রাথমিক শিক্ষক তাদের স্বাভাবিক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।

আজ এই মাত্র নিবেদন, দেশের যুগসন্ধিক্ষণে দেশের ভবিষ্যত আজ আপনাদের হাতে। আপনারা যদি নিজেকে হীন মনে না করেন, তবে আজ কারুর সাধ্য নেই যে আপনাদের হীন মনে করতে পারে। দেশের জনসাধরণের মধ্যে জাগরণ এসেছে। শ্রমিক আজ তার শ্রম-মূল্য বুঝে নিতে চায়। চাষী আজ তার সামাজিক মর্য্যাদার প্রতি সজাগ। যুগযুগান্ত ধরে তারা বঞ্চিত হয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ধনীর ঐশ্বর্য্য, তাদের পরিধানের বসন অপহরণ করে বিলাসীর বিলাস। তাদের দারিদ্র্য, রোগ, শোক, অনাহারে ও লাঞ্ছনায় আপনারা ছিলেন তাদের সাথী। আজ তাদের জাগরণের দিনে তাদের উদ্বুদ্ধ করবার, অন্যায়কে ধ্বংস করে সাম্যের ভিত্তিতে নতুন সমাজপত্তনে তাদের

প্রচেষ্টায়ও আজ আপনারাই তাদের শিক্ষাদাতা ও নেতা। প্রাথমিক শিক্ষক হবে প্রাথমিক সমাজস্রষ্টা, এই হোক আজ আপনাদের সংহতি ও সংগঠনের ভিত্তি।

নদীয়া শিক্ষক সম্মেলন, বৈশাখ ১'৪৬

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

ছাত্রসমাজে বিক্ষোভ ও অসংযমের যে-সব বিবরণ আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, দেশের শিক্ষাবিদ ও নেতৃবৃন্দকে তা ভাবিয়ে তুলেছে। একথা বোধ হয় মানতেই হবে যে যুব-সম্প্রদায়ের আচরণে খানিকটা শিথিলতা এসেছে, স্কুল-কলেজেও পূর্বের নিয়মানুবর্তিতা বা শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। আরো দুঃখের কথা, মাঝে-মাঝে এমন ঘটনা ঘটে যার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেরই মাথা হেঁট হয়ে যায়। সময় সময় শোনা যায় পরীক্ষার হলে নিরীক্ষকের উপর হামলা হয়েছে। কখনো কখনো শিক্ষক পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে মার খেয়েছে। পুলিস বা জনসাধারণের সঙ্গে ছাত্র-সমাজের মারপিটের ঘটনাও একেবারে বিরল নয়। অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে অনেক সময় এমন প্রলয়কাণ্ড ঘটে যায় যে ঘটনার আরম্ভ ও শেষের মধ্যে কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। স্কুল-কলেজে ছাত্রসংঘ বা ইউনিয়ন হবে কিনা, হলেও তার সদস্য সকল ছাত্রকে আবশ্যিকভাবে হতে হবে, না হওয়া না-হওয়ার ভার প্রত্যেক ছাত্রের মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত—এ প্রশ্নের সমাধানেও শেষ পর্যন্ত গুলি চলেছে। সিনেমার টিকেট কম দামে ছাত্রদের দিতে হবে, এ-দাবির উপর সিনেমা ঘর লুট হয়ে গেছে। ছোট ছোট ঘটনার এ-পরিণতি দেখে এই কথাই মনে হয় যে ছাত্রসমাজ আজ বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যহারা। তাদের জীবনের ভিত্তি টলে গেছে এবং তাই সামান্য কারণেই বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়।

যুবসম্প্রদায়ের এ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহী মনোভাব ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নয়। আজকাল পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর সকল দেশেই পুরাতন জীবন-দৃষ্টি ও সনাতন আদর্শ ধ্বংস হতে বসেছে। তার ফলে যে আদর্শহানি ও শূন্যতা, তাকে পূরণ করবে এমন কোন নতুন আদর্শও আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। প্রাচীন পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের স্বকীয় সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্মবিশ্বাসের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার পথ নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র ছিল। বর্তমান জগতে নানা দেশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় বিভিন্ন আদর্শ ও জীবনদৃষ্টির সম্পর্ক ও সংঘর্ষে তার ভিত্তি টলে উঠেছে। পৃথিবীর সকল দেশেই মানুষ আজ নতুন আলো, নতুন পথনির্দেশের প্রত্যাশী কিন্তু সে আলোক বা নির্দেশের প্রকাশ আজো স্পষ্ট নয়।

পৃথিবীময় আজ যে বিশ্বাস ও জীবনদৃষ্টির সংকট, তার ছায়া ভারতবর্ষেও পড়েছে। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসের যে গতি, ছাত্রবিক্ষোভের তা-ও অন্যতম কারণ। তাই অন্যান্য দেশে যেসব শক্তি সক্রিয়, তা ছাড়াও ভারতবর্ষের ছাত্রবিক্ষোভের কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ রয়েছে। সমস্ত কারণের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা সহজ নয়, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা না করেও একথা বলা চলে যে শিক্ষকের নেতৃত্বলোপ, সমাজে অর্থসংকট, শিক্ষাপ্রণালীর গলদ এবং জনসাধারণের একটি বিরাট অংশের আদর্শচ্যুতি, মোটামুটি এই চার পর্যায়ে তাদের ভাগ করা চলে। একথাও ভরসা করে বলা চলে যে ছাত্র-অসংযম আজ এ-দেশে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা ভাবনার বিষয় হলেও হতাশ হবার কারণ নেই। এখনো যদি সুসংবদ্ধভাবে ছাত্রবিক্ষোভের মূল কারণগুলি দূর করবার চেষ্টা করা

যায়, তবে অবস্থাকে আয়ত্তে আনা কঠিন নয়। রোগ জটিল, কিন্তু মারাত্মক নয়, তবে অবহেলা করলে বিপদ অনিবার্য্য।

১

রোগ কি, সে-কথা না জানলে যেমন রোগের চিকিৎসা করা চলে না, তেমনি ছাত্রবিক্ষোভের কারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তার প্রতিকার করা সম্ভব নয়। ছাত্র-অসংযমের কারণ বহু এবং ব্যাপক এবং তার বিশদ আলোচনা করতে গেলে এক বিরাট পুঁথি দাঁড়াবে। একটি কথা কিন্তু জোর করে বলা চলে। ছাত্র-অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার যত কারণ রয়েছে, তার মধ্যে শিক্ষকের নেতৃত্বলোপ সর্বপ্রধান। শিক্ষক ছাত্রসম্প্রদায়ের স্বাভাবিক নেতা, এবং যে-সব সমাজে শিক্ষকের নেতৃত্ব নিয়ে কোন সন্দেহ নেই, সেখানে ছাত্র-সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলাহীনতার কোন প্রশ্নও ওঠে না। ভারতবর্ষে এক-কালে শিক্ষকের স্থান সমাজের শীর্ষস্থানে ছিল। ভারতীয় ছাত্র-সমাজের প্রাক্তন গুরুভক্তিও সর্বজনবিদিত। তবু দুঃখের সঙ্গে এ-কথা স্বীকার করতে হয় যে বর্তমান কালে শিক্ষক ছাত্রসমাজের সে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অধিকারী নন। শিক্ষক যে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা অনেকখানি হারিয়েছেন এ-কথা মানতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মানতে হবে যে শিক্ষকের এ সম্মান-হানির জন্য কেবলমাত্র শিক্ষক একা দায়ী নন—এ-পরিণতির জন্য সমাজেরও গুরুদায়িত্ব রয়েছে।

সাম্প্রতিক ভারতে শিক্ষকের নেতৃত্বলোপের নানা কারণের মধ্যে কয়েকটি প্রধান কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। দেশে রাজনৈতিক চেতনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসমাজ রাষ্ট্রিয় আন্দোলনে জড়িয়ে

পড়েছে। সকল দেশেই তরুণ ও যুবসম্প্রদায় স্বাধীনতার আহ্বানে সাড়া দেয়—ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। বাঙলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই ছাত্রসমাজ রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যখন অসহযোগ আন্দোলনের শুরু হল, তখন থেকে ছাত্রসমাজ আরো ব্যাপকভাবে সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। সে যোগদান বহুক্ষেত্রে সাময়িক, কিন্তু সর্বদা ও সর্বত্র সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ না করলেও ছাত্রসমাজ রাষ্ট্রনেতাদের প্রভাব এড়াতে পারেনি। ফলে তরুণ ও যুবসম্প্রদায়ের মনে সকল রকম বন্ধন ও বাধানিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব প্রবল হয়ে উঠেছে। শিক্ষকসম্প্রদায় নানাকারণে ব্যাপকভাবে এ স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দেননি। তার ফলেও ছাত্রসমাজের মনে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হয়েছে এবং শিক্ষকের পরিবর্তে রাষ্ট্রনেতাদের উদ্দেশেই ছাত্রসমাজ সমস্ত শ্রদ্ধা অনুরাগ ও ভক্তি ঢেলে দিয়েছে। গান্ধীজি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত নেহেরু, মওলানা আজাদ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব অসাধারণ, তাই ছাত্রসমাজ যে তাঁদের প্রতি ঝুঁকে পড়বে, এবং সে তুলনায় শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে ছাত্রদের মনে শিক্ষকের প্রতি খানিকটা অবহেলার ভাব গড়ে উঠবে একথাও বিচিত্র নয়।

একদিকে রাষ্ট্রনেতাদের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, অন্যদিকে দিনরাত বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির নিন্দা, এই যোগাযোগে ছাত্রসম্প্রদায় একপক্ষে বর্তমান শিক্ষার প্রতি বিরাগশীল এবং অন্যপক্ষে শিক্ষক-সম্প্রদায় সম্বন্ধেও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। শিক্ষা-ব্যবস্থার নিন্দা বহুদিন হতে হয়ে আসছিল, কিন্তু বিগত বিশ-তিরিশ বৎসরে সে নিন্দা এক এক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এক ধরনের রাজ-

নৈতিকের পক্ষে তো শিক্ষাপদ্ধতিকে গালি দেওয়া প্রায় দৈনন্দিন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের প্রাত্যহিক দোষারোপের ফল যে কি বিষময়, তা ভাববার হয়তো তাদের সময় নাই, কিন্তু সমাজের নেতৃস্থানীয় সকলেরই আজ সে কথা বিচার করতে হবে। শিক্ষাপদ্ধতিকে আমূল নিন্দা করলেই শিক্ষার ধারা বদলাবে না, ধারা বদলাতে হলে ধীরভাবে বিচার করে সংশোধন ও পরিবর্তনের রূপ স্থির করা প্রয়োজন। বর্তমানে যেভাবে কেবল নিন্দার পালা চলেছে, তাতে বরং উপকারের বদলে অপকারই হচ্ছে। শিক্ষা-পদ্ধতিকে দিনরাত দোষারোপ করার ফলে শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়, শিক্ষকও ভাবতে শুরু করেন যে এ শিক্ষায় কোন লাভ নেই, কেবলমাত্র জীবিকা অর্জনের জন্য তবু শিক্ষকবৃত্তি আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে হবে। একদিকে শিক্ষকের আত্মপ্রত্যয় ও শিক্ষাবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায়, অন্যদিকে সমাজের আপামর সাধারণের মধ্যেও শিক্ষকদের প্রতি বিরাগ ও অবহেলার মনোভাব গড়ে ওঠে, তারাও শিক্ষককে ভাড়াটিয়া ভাবতে শুরু করে। শিক্ষাবৃত্তির প্রতি সমাজের যে সহজ শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন, তা লোপ হয়ে যায়। শিক্ষক ও সমাজের জনসাধরণ মনে যে প্রতিক্রিয়া তার প্রভাব ছাত্রসমাজের মনেও পড়ে। ছাত্রসমাজ ভাবতে শুরু করে যে এ শিক্ষার যখন কোনই মূল্য নেই, তখন তার জন্য কষ্ট বা সাধনা করবারই বা প্রয়োজন কি? নেহাত মা বাপের মনস্তুষ্টির জন্য স্কুল-কলেজে যেতে হয়, কিন্তু একবার হাজিরা দিয়েই খালাস। শিক্ষার তাৎপর্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা তারা করে না, ফলে শত দোষত্রুটি সত্ত্বেও বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে তাদের চরিত্র ও মনেরও যে উৎকর্ষসাধনের সম্ভাবনা আছে, তাও নিষ্ফল হয়ে যায়।

রাজনৈতিক আন্দোলনের চক্রাবর্তে শিক্ষকের মর্যাদা কমেছে। শিক্ষাপ্রণালীর নিরন্তর নিন্দাবাদে তার মনোবল ক্ষুণ্ণ এবং সমাজের চোখে তার মূল্য হ্রাস হয়েছে। অর্থনৈতিক কারণেও শিক্ষকের আর পূর্বের সম্মান মেলে না। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগে সরকারী বড় চাকুরিতে ভারতীয় কেউ ছিল না বললেই চলে, সওদাগরী অফিস বা ব্যবসা-বাণিজ্যেও উচ্চপদস্থ ভারতীয়ের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল। সাধারণ ভারতীয় পরিবারের আর্থিক আয়ের তুলনায় সেকালে শিক্ষকের উপার্জন নেহাত কম ছিল না। আজকাল ব্যবসায় বাণিজ্যে দেশরক্ষা বিভাগে এবং রাষ্ট্রীয় ও অন্তর্‌রাষ্ট্রীয় সরকারী চাকুরিতে নানাদিকে কাজের সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে গেছে। সে সব কাজের তুলনায় শিক্ষাবৃত্তির আয় অত্যন্ত অল্প বলে সে সব ক্ষেত্রে যাদের স্থান মেলে না তারাই আজ বহুক্ষেত্রে শিক্ষাব্রতী। সমাজের আর্থিকস্তরের নীচের তলায় বাসিন্দা হিসাবে তাই শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা যে কমে যাবে, তাতেই বা বিচিত্র কি ?

উপার্জনের দিকে প্রায় সকল সামাজিক মানুষেরই দৃষ্টি থাকে। যুদ্ধের সময় নানাকারণে সমাজে আর্থিক দুর্গতি কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছিল। আজও সে অর্থকষ্ট দূর হয়নি। তার ফলে বর্তমানে সে অর্থাগমস্পৃহা আরো প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের আগেও শিক্ষকের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, কিন্তু তবুও কোনক্রমে তার দিন চলে যেত। যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধান্ত যুগে আজ শিক্ষকের পক্ষে জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের সময় যেভাবে সব জিনিসের দর বেড়ে গিয়েছিল, তার ফলে বহু শিক্ষককে শিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে অন্য রুজির পথ দেখতে হয়েছে। বড় বড় শহরের তো কথাই নেই, গ্রামের

স্কুলের শিক্ষকেরও বহুক্ষেত্রে অন্য ব্যবসায় বা চাকুরি না নিয়ে উপায় ছিল না। পুরনো শিক্ষক স্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছে, নবযুবকেরা স্কুলের দিকে পারতপক্ষে আসেনি। যারা অন্য কোন উপায় করতে পারেনি, তারাই বাধ্য হয়ে স্কুলে রয়ে গিয়েছে। এখানে ওখানে হয়তো এ কথার ব্যতিক্রম মিলবে, এমন শিক্ষক সৌভাগ্যবশত আজো আছেন যাঁরা শিক্ষাবৃত্তির প্রতি অনুরাগের ফলে অন্য কোন দিকে ঝোঁকেননি কিন্তু তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। দেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের এক বিপুল অংশ জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত। সে পরাজয়ের গ্লানি ও তিক্ততা তাদের জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। ফলে একদিকে সমাজে তাদের স্থান আরো নীচে নেমে যায়, অন্যদিকে সে পরাজয়ের বিষ তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে সমাজের জীবন বিপন্ন করে তোলে। অসন্তুষ্ট ও হতাশ শিক্ষক যে সমাজের পক্ষে কত বড় বিপদ, বহুক্ষেত্রে সমাজ আজো সে কথা পুরোপুরি বোঝেনি।

শিক্ষার প্রসারের ফলেও যে শিক্ষকের মর্যাদা কমেছে এ কথা শুনলে আশ্চর্য লাগে, কিন্তু তবু কথাটি সত্য। সমাজে যখন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, তখন শিক্ষার এবং শিক্ষকের কদর অনেক বেশি ছিল। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকেরও আগেকার ইজ্জত নেই। কেবল তাই নয়, শিক্ষকের বেতন কম অথচ শিক্ষাবিস্তারের ফলে বহু শিক্ষকের প্রয়োজন। কম দামে বেশি জিনিস চাইলে তার গুণের তারতম্য হবেই, তাই অল্প বেতনে বহু শিক্ষকের নিয়োগে আজ বহু অযোগ্য লোক স্কুলে পাঠশালায় স্থান পেয়েছে। অযোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা যত বাড়ে, সমাজে শিক্ষকের মর্যাদাও তত কমে।

শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসংখ্যাও অপর্যাপ্ত ভাবে

বেড়েছে। পূর্বে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ফলে শিক্ষক ছাত্রের শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ-ভাজন ছিলেন। বর্তমানে বহু-ক্ষেত্রেই শিক্ষক ও ছাত্র পরস্পরের নাম পর্যন্ত জানে না—মুখ চেনা-চিনিটুকুও সর্বত্র নেই। শিক্ষকবৃত্তিতে আজকাল ভাল লোক এমনিতেই কম আসে, তাই এ অবস্থাতে ছাত্রসমাজ শিক্ষকের প্রতি দিন দিন আরো বীতরাগ হয়ে পড়ে। মেলামেশার অবকাশ নেই বলে ছাত্রসমাজ বহুক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রতি উদাসীন। সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক সঙ্গতি, পাণ্ডিত্য ও চরিত্রবল—কোন উপায়েই আজ শিক্ষক ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার সুযোগ পান না।

সমাজের আজ যে সংগঠন, তাতে শিক্ষকের কোন ক্ষেত্রেই নেতৃত্বের সুযোগ নেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনেতারা সর্বেসর্বা এবং বেচারা শিক্ষকের সেখানে স্থান নেই। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য সমাজের সাধারণ ব্যবস্থায়ও শিক্ষক অন্যের মুখাপেক্ষী। এমন কি শিক্ষার ক্ষেত্রেও বহুস্থলে শিক্ষকের নেতৃত্বের অবকাশ নেই। বিশ্ব-বিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল—সকল জায়গায়ই সমাজের হোমরাচোমরা লোকের কর্তৃত্ব। অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত অর্থশালী লোকের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্থান সহজেই মেলে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য সেখানে স্থান নেই। এমন কি শিক্ষাবিষয়ক আলাপ-আলোচনায়ও শিক্ষকের কথা বহুক্ষেত্রে টেকে না। তা ছাড়া, আজকাল সমস্ত শিক্ষাই পরীক্ষানির্ভর বলে পরীক্ষার জন্য ছাত্র তৈরি করাই শিক্ষকের একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরীক্ষার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক এবং শিক্ষকের আর্থিক অসচ্ছলতার ফলে আজকাল গৃহশিক্ষক বা প্রাইভেট মাস্টারের যে প্রাদুর্ভাব, তার ফলে শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা আরো কমে

গেছে। এমন শিক্ষকও আজকাল দেখা যায় যার সমস্ত সময় ও উদ্যম বাড়ি-বাড়ি ছাত্র পড়িয়ে খতম হয়ে যায়। স্কুলে কোনমতে হাজিরা দিয়ে মাসের শেষে মাহিনা সংগ্রহ করেই তারা স্কুলের কাজ সমাপ্ত করে। ছাত্র বা তার বাপ-মার কাছে সাক্ষাৎভাবে অর্থগ্রহণ করায় ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্কের মাধুর্য এবং সম্ভ্রমও লুপ্ত হয়ে যায়। ছাত্র মাস্টারকে ভাড়াটিয়া ভাবে, মাস্টারও ছাত্রকে অর্থসংগ্রহের উপায় মনে করতে শুরু করে। প্রাইভেট মাস্টারির ফলে দেশের শিক্ষাপ্রণালীর যে ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে, সমাজের অধিকাংশ লোক সে সম্বন্ধে অচেতন।

শিক্ষকের নেতৃত্বলোপের সমস্ত কারণ বলতে গেলে মহাভারত রচনা করতে হয়। এক কথায় সমাজ শিক্ষাবৃত্তির প্রতি পূর্বের শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে, শিক্ষকও রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের ফলে বর্তমানে পূর্বের মত সমাজের শ্রদ্ধাভাজন নয়। সমাজের শ্রদ্ধা হারিয়েছে, আর্থিক অবস্থাও অসচ্ছল, এসব কারণে বর্তমানে ধীমান ও চরিত্রবান ব্যক্তি শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণ করতে চান না। অন্যপক্ষে ভাল লোক শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ না করায় সমাজে শিক্ষকের স্থান আরো নীচে নামতে থাকে। ছাত্রদের নেতৃত্ব হারিয়ে শিক্ষক ভগ্নউৎসাহ ও নির্জীব—অন্যপক্ষে নির্জীব ও নিরুৎসাহ শিক্ষক ছাত্রসমাজের নেতৃত্বের অনুপযোগী। ফলে যে বিষচক্রের সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষচক্র ভাঙতে না পারলে সমাজের ভবিষ্যৎ বিপন্ন।

২

শিক্ষকের নেতৃত্বলোপ যে কোন পরিস্থিতিতেই শিক্ষা সংকটের সৃষ্টি করে। বর্তমানে সমাজে সর্বত্র যে আর্থিক দুর্গতি তার

ফলে সে সংকট আরো ভয়াবহ ও ব্যাপক রূপে দেখা দিয়েছে। আর্থিক দুর্গতির কথা অযৌক্তিক মনে হতে পারে, কারণ দেশে ব্যবসাবাণিজ্য এবং নানা ধরনের উদ্যোগ ও শিক্ষা দিন দিন বেড়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের সরকারী কাজের রাস্তাও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য খুলে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে পূর্বে বিভিন্ন দেশরক্ষা বিভাগে ভারতীয়ের স্থান ছিল না বললেই চলে। সৈন্যবাহিনীতে সাধারণ সিপাহী ও দু চারশো অফিসার, নৌ-বাহিনীতে লস্কর ও হাওয়াই সেনাদলে মুষ্টিমেয় পাইলট ছাড়া এসব কোন কাজে ভারতীয়ের বড় একটা দেখা মিলত না। বেসামরিক বিভাগেও ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্থান অপরিমিত ছিল না। বর্তমানে সামরিক এবং বেসামরিক সমস্ত বিভাগেই উচ্চতম পদের অধিকারী ভারতীয়। শুধু তাই নয়। সরকারী এবং বেসরকারী নানা ধরনের নতুন শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা-প্রসারের ফলেও নানা নতুন ধরনের কাজের সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু দেশে জনসাধারণের মধ্যে অর্থসংকট দেখা দিয়েছে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারসমস্যা দিন দিন গুরুতর হয়ে উঠছে। তার একটি কারণ যে এ ধরনের সুযোগ-সম্প্রসারণের তুলনায় উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঢের বেশি বেড়ে গেছে। যেখানে সরকারী বা বেসরকারী একটি চাকুরি বেড়ে যায়, তার উমেদার বাড়ে অন্তত দশ গুণ। শিল্প, উদ্যোগ বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণের গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর। তাই এ সমস্ত ক্ষেত্রেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পুরোপুরি সংকুলান হয় না।

এ অর্থসংকট অবশ্য কেবলমাত্র ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নয়। মহাযুদ্ধের কালে ধনদৌলত এবং সব রকমের সামগ্রীর যে বিনাশ হয়েছিল,

পৃথিবী আজো তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রসর দেশেও যখন আজ সব জিনিসের ঘাটতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনে নানা রকমের অর্থকষ্ট, তখন ভারতবর্ষের মতন অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশে যে এ সংকট আরো গুরুতর ভাবে দেখা দেবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? দ্রুত জনবৃদ্ধির দরুন দ্রব্যসংকট ও অর্থ-সমস্যা এদেশে আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। ঘটনার এ-পরম্পরা সমাজের পক্ষে এমনিতেই বিপজ্জনক হত কিন্তু জনসাধারণের মনোবৃত্তির পরিবর্তন সে বিপদকে আরো বেশি আসন্ন ও সঙ্গীন করে তুলেছে। গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে সমাজে কোন স্তরের লোকই আজ দারিদ্র্য বা অভাবকে ভাগ্যলিপি বলে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেও যে সামাজিক অসাম্য সহনীয় ছিল, আজ সমাজমানসে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোথাও ধূমায়িত, কোথাও বা খোলাখুলি ভাবে জ্বলে উঠেছে। সমাজ-মানসের এ-পরিবর্তন ছাত্রসমাজকেও বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে তার মাত্র কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা চলবে।

ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং তার ফলে আজ বহু ছাত্র সমাজের এমন স্তর থেকে আসে যে, জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় দাবি মেটাবার সঙ্গতিও তাদের নেই। শিক্ষার প্রসার সর্বব্যাপী করবার সাধনার ফলে দরিদ্রতম পরিবারের ছেলেমেয়েদেরও লেখাপড়ার সুযোগ মিলছে, এটা সমাজের পক্ষে হিতকর। লেখাপড়ার সুযোগ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা সমানভাবে হচ্ছে না এটা কিন্তু আশঙ্কার কথা। পূর্বে যখন ছাত্রসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তাদের অধিকাংশই সচ্ছল পরিবার থেকে আসত। দু চারটি গরিব ছাত্র যারা আসত, সমাজ কোন না কোন

ভাবে তাদের খোরাক-পোশাকের ব্যবস্থা করে দিত। ফলে ছাত্র অবস্থায় তাদের জীবন-যুদ্ধে নামতে হয়নি। লেখাপড়ায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা তাই সে যুগে সহজ ছিল। আজ সমাজের সকল স্তরের ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজে আসে এবং তাদের মধ্যে অনেককেই ছাত্র অবস্থায়ই জীবিকার্জনের পথ দেখতে হয়। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ছাত্রের সঙ্গে নিজেদের অবস্থার তুলনা করে তারা সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি বীতরাগ হয়ে পড়ে।

ছাত্রজীবনে দুঃখ-কষ্ট যতই হোক না কেন, শিক্ষার্থীর মনে তবু আশা থাকে যে শিক্ষার শেষে তার জীবন-সমস্যার একটা সুরাহা হবে। আগেকার দিনে বহু দরিদ্র ছাত্র এই আশ্বাসেই নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেও কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা সমাপ্ত করেছে, এবং বহুক্ষেত্রে সে আশা সফলও হয়েছে। আজ সে আশাও লোপ পেতে বসেছে। ছাত্রজীবন শেষ হবার আগেই আজ শিক্ষার্থী আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করে। শিক্ষার শেষে তার সামনে জীবনের যে সম্ভাবনা দেখা দেয়, তা এত নিরাশাময় যে শুধু এই কারণেই বহু ছাত্র শিক্ষার্থী-জীবনকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকে। স্কুল-কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই জানে না যে শিক্ষার্থী-জাবনের শেষে তারা কি করবে। ভবিষ্যতের কোন আশা নেই বলে তারা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ছাত্র থেকে যায়। বহু ক্ষেত্রে তাদের জীবনের কোন লক্ষ্য নেই, শিক্ষাও উদ্দেশ্যহীন, এবং লক্ষ্যহীন ও উদ্দেশ্যহারা বলে সে শিক্ষায় তাদের বিশেষ কোন লাভও হয় না। স্কুল-কলেজে না গিয়ে কি করবে এ কথা জানে না বলেই বহু ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজে আসে। কিন্তু এ ধরনের যে সব ছাত্রছাত্রী স্কুল-কলেজে ভিড় জমায়, তাদের লেখাপড়ায় মন থাকে না। কেবল সময় কাটাবার জন্যই তাদের বিদ্যার্থীজীবন। কেউ কেউ কাজের

ধান্দায় ফেরে এবং যতদিন কাজ না মেলে ততদিন কলেজের খাতায় নাম রাখে। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী কি কাজ খুঁজবে তাও জানে না। দৈবের হাতে ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে ভাবে যে একটা না একটা গতি হয়ে যাবে, আর যতদিন কোন কাজ না জোটে, লেখাপড়ার ভান করে কোনক্রমে সময় কাটিয়ে দেবে।

এ ভাবে স্রোতে গা ভাসিয়া দেওয়ার বিপদ অনেক। তার ফলে চরিত্র এবং মনের বাঁধন ভেঙে যায়, কঠিন সাধনা করবার শক্তি লোপ পায়। কেবল তাই নয়, লক্ষ্যহীনভাবে বেশিদিন লেখাপড়া করার আর এক বিপদ আছে। স্কুলে বা পাঠশালায় যার শিক্ষা শেষ হয়েছে, সমাজের কাছে তার চাহিদা কম, ছোটখাটো কাজ পেলেই সে সুখী। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে যারা কলেজের দরজায় পৌঁছে তাদের দাবি সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়, এবং আগে যে-কাজ খুশী মনে করত, তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। আজকাল শিক্ষাপদ্ধতিকে দিনরাত গালমন্দ করার যে রেওয়াজ হয়েছে, তার ফলে এমনিতেই ছাত্রসমাজ শিক্ষার প্রতি বীতরাগ। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রজীবনের প্রত্যাশা এবং কর্মজীবনের বাস্তবের মধ্যে যে পার্থক্য, লক্ষ্যহীন শিক্ষার ফলে তা যুবসমাজের মনকে আরো বিষিয়ে তোলে। আশাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের বাঁধন শিথিল হতে থাকে এবং ফলে সমাজের ভিত্তি নড়ে যায়।

আর্থিক অনিশ্চয়তার ফলে ছাত্রজীবনের কঠোর সংগ্রাম আরো কঠিন হয়ে দেখা দেয়। অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের কথা বাদ দিলে বাকি প্রায় সবাইকেই হয়তো অংশত অথবা পুরোপুরিভাবে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করতে হয়, কিন্তু সে ব্যবস্থা প্রায়ই অনিশ্চিত এবং অসম্পূর্ণ। সচ্ছলভাবে দূরে থাক, মোটামুটি ভাবেও তাতে

জীবিকার সংস্থান হয় না, অথচ সে রকম অনিশ্চিত এবং অসম্পূর্ণ ব্যবস্থাও পরবর্তী জীবনে অনেকের ক্ষেত্রেই আশাতীত হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্রজীবনের শেষে ভবিষ্যৎজীবন অন্ধকার এবং নিরাশাময় বিভীষিকার সৃষ্টি করে, অথচ ছাত্রজীবনেও সুখ বা স্বস্তি নেই। অধিকাংশ ছাত্র যে কি কষ্টে জীবন নির্বাহ করে, সেকথা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের পক্ষে বোঝাও কঠিন। মুষ্টিমেয় সচ্ছল পরিবার ভিন্ন সর্বত্রই ছাত্রছাত্রীরা আরামের কথা ভাবতেও পারে না, বরং অধিকাংশ যে ভাবে বাস করে, তাকে মনুষ্যজীবনের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা চলে না। স্কুল-কলেজের বোর্ডিং হস্টেলে ব্যবস্থা মোটা-মুটিভাবে সহনীয়, কিন্তু বহু পরিবারে বা মেসে জীবনযাত্রার যে ব্যবস্থা, তাতে ছাত্রছাত্রীরা যে কি ভাবে বেঁচে থাকে তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবস্থা যেখানে নেই, সেখানে যে অবসর বা নিরালা জুটবে এ কথা কল্পনা করাও অন্যায়। আলোবাতাসহীন অন্ধ কুঠুরিতে যারা বাস করে, তাদেরই মত অন্য ছাত্রছাত্রী—সংখ্যা তাদের যতই মুষ্টিমেয় হোক না কেন—আরামে বিলাসে দিনযাপন করছে, দেখে তাদের সমস্ত মন যে বিপুল বিদ্রোহে বিষায়িত হয়ে উঠবে, তাতে আশ্চর্য কি? বর্তমানযুগের সাম্যসন্ধানী মনোভাবের ফলে সমাজের বৃহত্তর অংশে তাই আজ কেবলমাত্র প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি নয় বরং সমস্ত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রবল ও নিরুদ্ধ আক্রোশ জমে উঠছে।

৩

কারণে অকারণে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল নিন্দা বন্ধ করা যেমন একদিকে প্রয়োজন, অন্যদিকে শিক্ষাপদ্ধতির যে সব

গলদ সহজেই চোখে পড়ে, সেগুলি দূর করবার ব্যবস্থা করা তেমনি জরুরী। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোন শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি যাকে সব রকমে নিখুঁত ও ত্রুটিহীন বলা চলে। তাই আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতেও যে গলদ থাকবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ কথার অর্থ কিন্তু এ নয় যে খুঁত-ত্রুটিকে মেনে নিতে হবে। বরং সর্বদাই আমাদের প্রয়াস হওয়া উচিত যে দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে অবিলম্বে তার প্রতিকার করা। বর্তমান পদ্ধতির মধ্যে কয়েকটি এমন গলদ রয়েছে যে তার ফলে ছাত্রসমাজ পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ ও অশান্তি বেড়ে যায়, এবং ফলে সমাজজীবন ব্যাহত হয়ে পড়ে। যে সমস্ত ত্রুটির অবিলম্বে প্রতিকার প্রয়োজন, তারই প্রতি সংক্ষেপে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাক।

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি অতিরিক্তভাবে পুস্তক-ঘেঁষা ও অব্যবহারিক একথা না মেনে উপায় নেই। যারা উচ্চশিক্ষাকেই জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে চায়, তাদের জন্য এ ব্যবস্থা সমীচীন হতে পারে, কিন্তু সমাজের অধিকাংশ লোক ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পকলা বা বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মের প্রত্যাশী, এবং এ শিক্ষাপ্রণালী তাদের প্রয়োজন পুরোপুরি মেটাতে পারে না। এ শিক্ষায় বুদ্ধির বিকাশের প্রতি যতোখানি ঝোঁক, কর্মকুশলতা, আবেগ বা ললিত মনোবৃত্তি বিকাশের দিকে ততখানি দৃষ্টি নেই। কেরানী তৈরি করা এ শিক্ষার লক্ষ্য এ কথা বলা নিশ্চয়ই অন্যায়, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এ শিক্ষার ফলে সফেদপোষ কাজের দিকে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ঝুঁকে পড়ে, এবং অনেকেই অন্য কোন ধরনের কাজের জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে যায়। এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে বর্তমান

শিক্ষাপদ্ধতি ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিকাশ এবং দৈহিক উৎকর্ষের প্রতি ততটা মনোযোগ দেয় না। আজকালকার লেখাপড়া জানা লোকের মধ্যে হাতের কাজে অরুচি ও তার ফলে করকুশলতার অভাব প্রায়ই দেখা যায়। যুবসম্প্রদায়ের চরিত্র-গঠন এবং নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধের বিকাশও এ শিক্ষাপ্রণালীতে আশানুরূপ হয়নি।

নিছক শিক্ষার দৃষ্টিতেও বর্তমান পদ্ধতি পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে আপত্তি করবার বিশেষ কিছু নেই, বরং কেবল পাঠ্যক্রম বিবেচনা করলে পৃথিবীর যে কোন দেশের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পদ্ধতির তুলনা করা চলে। শিক্ষার্থী যদি সে পাঠ্যক্রমের উপযুক্ত ব্যবহার করে, তবে স্বাধীন চিন্তা ও সন্তুলিত বিচারশক্তির বিকাশ হবেই। দুঃখের কথা এই যে পাঠ্যক্রমের উপযুক্ত ব্যবহার হয় না। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী কেবলমাত্র পুঁথিগত তথ্য সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হয়, ফলে বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি বিকাশের বদলে অপ্রয়োজনীয় তথ্যের জঞ্জালে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

শিক্ষার এ অপপ্রয়োগের অন্যতম প্রধান কারণ পরীক্ষায় ভাল করবার অযৌক্তিক আগ্রহ। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে পরীক্ষার মর্যাদা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে। ছাত্র উপযুক্ত জ্ঞান আহরণ করেছে কিনা, তার বিভিন্ন বৃত্তির যথোপযুক্ত বিকাশ হয়েছে কিনা তা জানবার জন্যেই পরীক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বহুক্ষেত্রে পরীক্ষাই ছাত্রজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত ছাত্রজীবনে শিক্ষার্থী কি করল, বৎসরের বারো মাস কিভাবে কাটাল, তার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে কেবলমাত্র শেষ পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে তার কৃতিত্ব বিচার করা হয় বলে পরীক্ষার মর্যাদা আরো বেড়ে গেছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা সারা বৎসর লেখাপড়ায় অবহেলা করে,

এবং পরীক্ষার ঠিক আগে কয়েক সপ্তাহ দিনরাত খেটে পরীক্ষাসাগর পাড়ি দিতে চায়। পরীক্ষার মাপকাঠিতে তারা সমস্ত পাঠ্যবিষয়ের বিচার করে। পরীক্ষায় যে সব প্রশ্ন আসতে পারে, তার বাইরে জ্ঞান-জগতের দিকে একেবারেই দৃষ্টি দিতে চায় না। ফলে কোন বিষয় ঠিকভাবে আয়ত্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেবল পরীক্ষণীয় তথ্যগুলি না বুঝে মুখস্থ করায় বুদ্ধির চেয়ে স্মরণশক্তির বিকাশের দিকে ঝোঁক পড়ে বেশি।

পরীক্ষাসর্বস্ব শিক্ষায় আরো অনেক বিপদ আছে। সারা বৎসর শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় অবহেলা করে বলে তাদের অবসর প্রচুর। কৈশোর ও যৌবনের বিপুল প্রাণশক্তি ও উদ্যম পুরোপুরিভাবে শিক্ষার কাজে লাগে না, তাই নানান প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়ভাবে তার ব্যবহার হয় এবং সময় সময় সে ব্যবহার সমাজের পক্ষে অহিতজনক। প্রত্যেক অভিজ্ঞ শিক্ষক জানেন যে স্কুলে ছেলেদের নানান কাজে মশগুল রাখতে না পারলে তারা গোলমাল দুষ্টামি করবেই। ছাত্রসমাজের স্বাস্থ্যের দিক থেকেও বর্তমান ব্যবস্থা অবাঞ্ছনীয়। সমস্ত বৎসর পরিমিত ও নিয়মিত পরিশ্রমের বদলে কয়েক মাস অতিরিক্ত খাটুনি, রাত্রিজাগরণ এবং খাওয়াপরার সম্বন্ধে অনিয়মের ফলে পরীক্ষার পূর্বে বা পরে বহু ছাত্রের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। গুরুতর কোন অসুখ না হলেও প্রাণশক্তির অনর্থক অপচয় ঘটে। কেবল তাই নয়। পরীক্ষাসর্বস্ব শিক্ষার ফলে নিয়মিতভাবে কাজ করবার অভ্যাস শিথিল হয়ে পড়ে। সারা বৎসর শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অবহেলা করে শেষ কয়েক সপ্তাহে সে গাফিলতি সুদে-আসলে পুরিয়ে নিতে চায়। দিনের পর দিন স্থিরচিত্তে কাজ করবার শিক্ষা তাদের মেলে না। পরীক্ষার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়ায় শিক্ষার্থী

যেনতেন প্রকারে পাস করবার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে, এই বোধহয় এ ব্যবস্থার সবচেয়ে খারাপ ফল। পরীক্ষা-কেন্দ্রে নকল, প্রশ্ন আগে থেকে জানবার প্রয়াস, পরীক্ষককে নানাভাবে তোয়াজ করবার চেষ্টা এবং আরো গুরুতর যে সব উপসর্গ আজ দেখা দিয়েছে, তা দেশের হিতকামী সবাইকেই ভাবিয়ে তুলেছে।

শেষ পরীক্ষার উপর এত গুরুত্ব দেওয়ার যে সব কুফল, ডিগ্রীর জন্য অস্বাভাবিক মোহ তাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। সে জন্য কেবল ছাত্রদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আজ পরিস্থিতি এই যে সরকারী বা বেসরকারী অফিস, এমন কি ব্যবসাবাণিজ্য দোকান-পসারীর কাছেও কাজ করতে চাইলে ডিগ্রী প্রয়োজন। জীবিকা নির্বাহের জন্য ডিগ্রী না হলে যখন চলে না, তখন ডিগ্রীলাভের জন্য ছাত্রছাত্রীরাও মরীয়া হয়ে ওঠে। সারা বৎসর লেখাপড়া করেনি, তার জন্য তাদের মনে কোন ক্ষোভ নেই, কিন্তু শেষ কয়েক সপ্তাহে ভালোমন্দ নানা পন্থা অবলম্বন করে ডিগ্রী পেতেই হবে, এই হয় তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

ডিগ্রীর লোভে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে কলেজে আসে যাদের উচ্চশিক্ষার প্রতি আকর্ষণ নেই, যোগ্যতাও নেই। তারা কেবল ক্লাসে ভিড় বাড়িয়ে ক্ষান্ত হয় না। বহুক্ষেত্রে ক্লাসে যা পড়ানো হচ্ছে তা তাদের আয়ত্তের বাইরে বলে তারা অমনোযোগী হয়ে পড়ে, ক্লাসকে গল্পগুজবের আড্ডায় পরিণত করে। ফলে যে সব ছাত্র ক্লাসে পড়ালেখা করতে চায়, তাদেরও কাজের পদে পদে ব্যাঘাত হয়, শিক্ষার মানও নেমে যায়। সমাজের বন্ধনও তাতে শিথিল হয়ে পড়ে। ক্লাসে যারা অনুশাসন লঙ্ঘন করতে শেখে, ধীরে ধীরে জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও তারা আইন ভাঙতে শুরু করে।

ছাত্রসমাজে আজ যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ, শিক্ষাপদ্ধতির প্রভুত্ববাদী রূপ তার অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের সমাজে এমনিতেই মুরুব্বিয়ানা ও প্রভুত্ববাদ প্রবল, তাই বয়োজ্যেষ্ঠর সঙ্গে মতভেদ হলে আমরা তাকে ধৃষ্টতা মনে করি। এ রকম সামাজিক আবহাওয়ায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার বড় বেশি অবকাশ নেই। পাঠ্যক্রমের কথা তো দূরে থাক, স্কুল-কলেজের অন্যান্য ক্রিয়াকার্যের ব্যাপারেও শিক্ষক বা অভিভাবকবর্গ যে আদেশ দেন, বিনাবাক্যে তাকে পালন করাই শিক্ষার্থীর একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। অনবরত হুকুম তামিল করে করে ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্ববোধ বিকাশের বড় একটা অবকাশ মেলে না। ফলে স্কুল-কলেজ গণতান্ত্রিক সমাজ-সংস্থা না হয়ে প্রভুত্ববাদী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। সেখানে প্রতি স্তর উপরের স্তরের নির্দেশ বিনাবাক্যে পালন করে, এবং নীচের স্তরের কাছে থেকে ঠিক তেমনি অপ্রশ্ন আনুগত্য দাবি করে। যতদিন এ শিক্ষার ফলে ভবিষ্যৎ রুজির পথ সুনিশ্চিত ছিল, ছাত্র বা অভিভাবক কেউই শিক্ষার এ প্রভুত্ববাদী ধাঁচে বিশেষ কোন আপত্তি করেনি। আজকাল আর সে ভরসা নেই, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে, তাই শিক্ষার এই মুরুব্বিয়ানা ঢঙ তারা আর সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের মনে শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরো প্রবল হয়ে উঠেছে এই জন্য যে গত ত্রিশ চল্লিশ বৎসর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসারের ফলে দেশময় নিয়মভঙ্গ ও আদেশ লঙ্ঘনের এক আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে। অসহযোগ আন্দোলন বা সত্যাগ্রাহী কার্যক্রমের ফলে জনসাধারণ শিখেছে যে অন্যায় আইন অমান্য করাই কর্তব্য। আইন ন্যায্য কি অন্যায্য সে বিচার সবক্ষেত্রে সহজ নয়—অনেক

ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি ও বিচারের উপর সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। ছাত্রদের বেলায় দেখা গেছে যে একবার নিয়ম ভাঙতে শিখলে তারা আর ভালোমন্দ নিয়মের বাচবিচার করে না। নিয়ম ভাঙার অভ্যাস গড়ে উঠলে আইনের প্রতি অবজ্ঞা এসে যায়। রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের দিনে ছাত্রসমাজ আন্দোলনে যে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল, আজকার ছাত্রবিক্ষোভ বহুক্ষেত্রে তার বহুদূরব্যাপী পরিণাম।

দেশের রাজনৈতিক দলাদলি এ সমস্যা আরো সঙীন করে তুলেছে। স্বাধীনতা অর্জনের পরে যদি রাষ্ট্রনেতা বা রাজনৈতিক দল ছাত্রসমাজকে ব্যবহার করবার চেষ্টা না করত, তবে ধীরে ধীরে ছাত্রসমাজ পূর্বের নিয়মানুবর্তিতা ও শিক্ষার নিয়ন্ত্রণে ফিরে যেত। বস্তুতপক্ষে কিন্তু তা হয়নি। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে ছাত্রসমাজ যে ভাগ নিয়েছিল, তা দেখে বহু রাষ্ট্রনেতা বুঝেছেন যে দেশের এ যুবশক্তিকে আয়ত্তে রাখলে রাষ্ট্রশক্তি অর্জন সহজ। তাই ছাত্রদের ঘরোয়া ব্যাপারে রাজনৈতিক দল-উপদলের কর্মী অংশ নেয়, এবং তুচ্ছ ব্যাপারে ছাত্রদের উত্তেজিত করে নিজেদের সুবিধা করতে চায়। শিক্ষকের নেতৃত্বলোপ এবং শিক্ষাপ্রণালীর মুরুব্বিয়ানা ঢঙ এ সমস্ত অপচেষ্টার আপাত-সফলতার অন্যতম কারণ।

৪

নিদারুণ দারিদ্র্যে মানুষের সুকুমার চিত্তবৃত্তি ও আদর্শবোধ নষ্ট হয়ে যায়। আজকাল সমাজের অধিকাংশ স্তরে যে আর্থিক অনটন, আদর্শচ্যুতি ও লক্ষ্যভ্রান্তির ফলে তার প্রভাব আরো মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। এ আদর্শচ্যুতি ও লক্ষ্যভ্রান্তির কারণ ব্যাপক ও বহুদিন ধীরে ধীরে জমে উঠেছে। গত বিশ-ত্রিশ বৎসরে

পৃথিবীর ইতিহাসের যে গতি, তার ফলে মানবসমাজে লোভ, নিরাশা ও বিদ্রোহ ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে। এ পরিণতির সমস্ত কারণ বিশদভাবে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়, তবে কয়েকটি প্রধান কারণের প্রতি ইঙ্গিত করা যেতে পারে।

পর পর তুইটি মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীব্যাপী নৈতিক ও সামাজিক অবনতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যুদ্ধ বাধলে সত্য ও আদর্শের নাশ হয় সর্বপ্রথম। দেশ সেবার নামে ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত নৈতিক মূল্য বিসর্জন দিতেও লোকে দ্বিধা বোধ করে না। শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা সাধারণের চোখে কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধের সুযোগে একদল লোক চোরাবাজারে তু হাতে পয়সা লোটে, ন্যায়-অন্যায়ের কোন বালাই মানে না। যারা বেআইনি কাজে পরাঙ্মুখ, অন্যায় উপায় অবলম্বন করতে চায় না, তাদের তুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না। একদিকে ভদ্র নিয়মানুগ লোকের তুঃখ-কষ্ট, অন্যদিকে অন্যায়কারী মুনাফাখোরের বিলাস-ব্যসন, এসব দেখে দেখে সমাজের নৈতিক বাঁধন শিথিল হয়ে আসে। চোরাবাজারী, ঘুষ ও দাগাবাজি, সবরকমের ভ্রষ্টাচারের ফলে যে নৈতিক অবনতি, ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের উপরে তার বিষময় প্রভাব দেখা দেয়।

সমাজের নৈতিক আবহাওয়া ঘোলাটে করা ছাড়াও যুদ্ধ সাক্ষাৎভাবে ছাত্রসম্প্রদায়কে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়। যুদ্ধের মৌসুমে নানারকমের ব্যবসা-বাণিজ্যে কাজের ভিড় লেগে যায়। সরকারী দপ্তরেও আকস্মিকভাবে নূতন লোকের প্রয়োজন হয়। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত, কেউ তখন বেকার বসে থাকে না। শান্তির সময় মানুষ কাজ খুঁজে বেড়ায়। যুদ্ধের বাজারে কাজ মানুষের অপেক্ষায় তৈরী হয়ে থাকে। বহু লোকে আঙুল ফুলে

কলাগাছ হয়ে ওঠে, এবং সে উন্নতির বেলা যোগ্যতার বাচ বিচার বহু ক্ষেত্রে থাকে না। আদর্শহীন কুচক্রী রাতারাতি লাখপতি হয়ে যায়। লোকে ভাবতে শুরু করে—সাংসারিক সফলতার জন্য চরিত্রবল, যোগ্যতা বা কঠিন পরিশ্রমের কোন প্রয়োজন নেই, সুযোগ বুঝে দাঁও মারতে পারলেই হল। এ রকম পরিবেশে যে যুবসম্প্রদায়ের আদর্শচ্যুতি ঘটবে, শিক্ষার স্তর এবং বিদ্যার সমাদর কমে যাবে, তাতে আশ্চর্য কি?

বস্তুকেন্দ্রিক ভাবধারার প্রসারের ফলেও সমাজের নৈতিক আদর্শহানি হয়েছে। আদর্শবাদী আদর্শের খাতিরে সব কিছু বিসর্জন দিতে পারে, বস্তুবাদী ব্যবসায়ী বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কিসে কতখানি লাভ-লোকসান হবে। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা চলে এ বিশ্বাসের ফলে সমাজে নৈতিক দুর্বলতা আসে। সাম্যবাদের আদর্শবিচারে এ কথা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। সাম্যবাদে সামাজিক ন্যায় ও বিচারের যে আদর্শ, তা তরুণ মনকে স্বতঃই আকর্ষণ করে, কিন্তু সে আদর্শসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন সাম্যবাদী দল যে সমস্ত অন্যায় উপায় অবলম্বন করে, তার ফলে যে সে-আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, যুবসম্প্রদায়ের সে বিষয়ে খেয়াল থাকে না। সাম্যবাদের এ আদর্শবাদী আবেদনের ফলে যুবসম্প্রদায় প্রচলিত মূল্যবোধ সম্বন্ধে আরো উদাসীন হয়ে পড়ে। আর্থিক দুর্গতি, বেকারসমস্যা ও আশাভঙ্গের বেদনায় বর্তমান যুবসমাজ এমনিতে চঞ্চল। এ অবস্থায় যে সাম্যবাদের আহ্বানে তারা সাড়া দেবে, তাতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। সাম্যবাদী সমাজে সনাতন নৈতিক আদর্শ বদলে যাবে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অবকাশ থাকবে না, এ সব কথা তাদের মনে লাগে না। যে অনিশ্চয়তা ও অনটনের মধ্যে তাদের

দিন কাটে, সে অবস্থার যদি প্রতিকার হয়, অন্তত খাওয়াপরার একটা স্থির আশ্বাস মেলে, তবে তার জন্য নৈতিক আদর্শ বা ব্যক্তি-স্বাধীনতা কোরবানী করতে অনেকেই ক্ষণমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।

আর্থিক অনিশ্চয়তার ফলে যুবসম্প্রদায়ের যে মানসিক দুর্গতি, সামাজিক ও পারিবারিক বিপর্যয়ের দরুন সে দুর্গতি আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। পুরাতন সমাজবন্ধন শিথিল হয়ে গেছে, নূতন সমাজ-ব্যবস্থা বা সামাজিক আদর্শ আজো শূন্যস্থান পূর্ণ করেনি। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও বিশ্বাস জীর্ণ হয়ে গেছে বলে যুবসম্প্রদায়ের মন তাতে সাড়া দেয় না। পূর্বে বাপ-মা, ভাই-বোন আত্মীয়স্বজন সবাই এক গোষ্ঠীতে যুক্ত পরিবারে বাস করত। তখনকার সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি নিজের স্থান সহজেই খুঁজে পেত, বিপদে আপদে কোথায় সাহায্য মিলবে, রোগেশোকে বা বেকার অবস্থায় কোথায় আশ্রয় মিলবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। আজ যুক্ত পরিবার ভেঙে পড়ছে। কেবল যুক্ত পরিবার নয়, ছোট ছোট পরিবারেও বাপ-ছেলে, মা-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ আগেকার মত সহজ ও নিবিড় নেই। পূর্বে অধিকারের চেয়ে কর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য ছিল বেশি, পিতার কর্তৃত্ব বা স্বামীর কর্তৃত্ব নিয়ে কারো মনে কোন প্রশ্ন উঠত না। আজ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অধিকারের কথা ভাবে, কিন্তু অধিকারের দাবি এবং কর্তব্যবোধ যে পরস্পর-নির্ভর সে কথা সব সময় স্মরণ রাখে না। পুরাতন সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেকের ভালোমন্দের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বহুক্ষেত্রে কার্যকরী ছিল, তা আজ লুপ্ত হতে বসেছে, অথচ পরস্পরের দাবিদাওয়া স্বীকার করে নিয়ে নতুন সামাজিক সম্বন্ধ আজো সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়নি। বুদ্ধি দিয়ে যারা নতুন সামাজিক

সম্বন্ধকে গ্রহণ করেছে, তারাও আবেগ ও সংস্কার নিয়ে তাকে নিজস্ব করে নিতে পারেনি। পূর্বে যুক্ত-পরিবারের পরিবেশে শিশুকাল থেকেই সমাজ জীবন যাপনের শিক্ষা মিলত, বর্তমানের বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র পরিবারে একটি দুটি শিশু বয়স্কদের মধ্যে বাস করে বলে সে সহজ-শিক্ষা তাদের মেলে না। সমাজবন্ধন শিথিল হওয়ায় ব্যক্তি আজ নিজেকে নিঃসঙ্গ ও নিরাশ্রয় মনে করে। সমাজের ও পরিবারের উপরে তার পূর্বের সহজনির্ভর লুপ্ত হয়ে গেছে। আজ ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়ের মনে যে অশান্তি ও বিদ্রোহ, তার মূলে এই অনুভূতিও রয়েছে যে আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে বলে তারা আজ সংসারে আশ্রয়হীন।

স্বাধীনতা লাভের পর ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের সামনে পরিবেশের আর একটি পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বিশ-পঁচিশ বৎসর আগে যাঁরা জাতীয় আন্দোলনের নেতা তাঁরাই ছিলেন যুবসম্প্রদায়ের আদর্শ। সেকালে জাতীয় আন্দোলনে যাঁরা অংশ-গ্রহণ করেছেন, তাঁদের দুঃখ ও বিপদের পথে চলতে হয়েছে। তাই সে যুগের ছাত্র আদর্শ-বাদী আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গকে জীবনের চরম মূল্য বলে জেনেছে। স্বাধীনতালাভের পরে সে যুগের দুঃখসন্ধানী নেতা আজ রাজশক্তির অধিকারী। রাজাসনের ঐশ্বর্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিলাস দেখে ছাত্রসম্প্রদায় তাই আজ সময় সময় আদর্শের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ছাত্রসমাজ অনবরত পরিবর্তনশীল, চার-পাঁচ বছরে কলেজের ছাত্রসমাজ পুরোপুরি বদলে যায়। কাজেই আজকার বহু ছাত্র রাষ্ট্রীয় নেতাদের পূর্বযুগের সাধনা বা দুঃখের কথা হয় জানে না, নয় ভুলে গেছে। এ পরিবর্তনের ফলে ছাত্রসমাজের মানসিক আবহাওয়ার যে পরিবর্তন,

তার ফলে আদর্শবাদের স্থান বহুক্ষেত্রে সুবিধাবাদ দখল করে নিয়েছে।

সমাজে শিক্ষকের যে অনাদর, তা দেখে ছাত্রসমাজের আদর্শবাদ আরো শিথিল হয়ে পড়ে। শিক্ষকের প্রতি সমাজের অবজ্ঞার ফলে শৈশব থেকে তাদের মূল্যভাবনা বিকৃত হয়ে যায়। পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে যে শিক্ষক পরম গুরু, অথচ বাস্তবজীবনে শিক্ষকের স্থান সমাজের নিম্নতম স্তরে। শিশুকাল থেকেই তাই ছাত্রছাত্রীদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে কেতাবের কথা আর জীবনের বাস্তবের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। মুখে যা বলি কাজে তা করি না, এবং করার কোন প্রয়োজন নেই, এই মনোবৃত্তি একবার সমাজে প্রচলিত হয়ে গেলে সে সমাজের অবনতি অনিবার্য। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেছিলেন যে মিথ্যাচার ও মিথ্যা ভাবনা ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় গ্লানি। তাই শিক্ষকের প্রতি অবজ্ঞা ও অনাদরের ফলে সমস্ত সমাজে মিথ্যাভাবনা এবং মিথ্যাচার ছড়িয়ে পড়ে।

উপরে যে সব কারণের উল্লেখ করা হল, তাদের সম্মিলিত ফল এই যে যুবসম্প্রদায় সাংসারিক সফলতাকেই একমাত্র কাম্য বলে ভাবতে শুরু করেছে। সফলতারও নানা রকম পর্যায় আছে। বহুদিনব্যাপী সাধনা বা কঠিন তপস্যার ফলে যে সফলতা, সাহিত্য বা শিল্পরচনায় শিল্পীমনের যে বিকাশ, জ্ঞানের সন্ধানে বৈজ্ঞানিকের যে কঠোর অনুরাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনা, সেদিকে ছাত্রসম্প্রদায়ের আজ দৃষ্টি নেই—তাদের একমাত্র লক্ষ্য কি ভাবে সহজে, ফাঁকি দিয়ে, চালাকি করে ধন উপার্জন বা সমাজে উচ্চস্থান দখল করা যায়। সফলতার মরীচিকায় বিভ্রান্ত যুবসম্প্রদায় তাই আজ সহজেই বিক্ষুব্ধ

হয়ে ওঠে, সামান্য বাধা পেলে সমাজের প্রাচীনতম বিশ্বাস বা প্রতিষ্ঠানকে আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করে না।

৫

ভারতীয় ছাত্রসমাজের অশান্তি ও অনুশাসনহীনতার প্রধান প্রধান কয়েকটি কারণের আলোচনা এ পর্যন্ত করেছি। এবার তার প্রতিকারের বিষয়ে বিচার করা যাক। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে সমস্ত কারণগুলি একসাথে দূর করা যাবে না। বহুদিন ধরে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, আকস্মিকভাবে তার সমাধান করা অসম্ভব। রোগ জটিল ও প্রাচীন হলে তার চিকিৎসা বহুদিনব্যাপী ও কঠিন হতে বাধ্য। একথাও মানতে হবে যে প্রতিকারের উপায় নিয়ে মতভেদের অবকাশ রয়েছে। সে সব সমাধান সকলের মতেই সমীচীন, তার মধ্যেও কোনটি আগে কোনটি পরে প্রয়োগ করা উচিত, কোন সমাধানের সার্থকতা কতখানি, এসব বিষয়ে মতের তারতম্য হতে পারে। এক কথায়, ভেলকি বা জাদুমন্ত্রে এ মুশকিলের আসান হবে না।

সমাধানের অন্য উপায় নিয়ে যতই মতভেদ হোক না কেন, একটি ব্যাপারে মতভেদের অবকাশ নেই বলেই আমার বিশ্বাস। সেটি হল শিক্ষকের লুপ্ত নেতৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সমাধানের সমস্ত উপায়ের মধ্যে এটিই মুখ্য। অন্যান্য উপায় অবলম্বন করতে হলে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা রকমের সংস্কার প্রয়োজন—এ সমাধান একান্তভাবে শিক্ষাক্ষেত্রনির্ভর। তা ছাড়া শিক্ষকের নেতৃত্ব ফিরে এলে সমাজের অন্যান্য গলদগুলিও অনেকখানি শোধরাবে। বর্তমানে ছাত্রদের মধ্যে যে নিরাশা ও ব্যর্থতাবোধ,

উপযুক্ত শিক্ষকের সংস্পর্শে তা দূর হতে বাধ্য। ছাত্রসমাজ যদি আদর্শবোধ ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়, তবে সমাজের প্রত্যেক স্তরেই তার প্রভাব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বে।

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকের নেতৃত্ব যাতে ফিরে আসে সেই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন তা-ই আমাদের প্রথম কর্তব্য। তা করতে হলে শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষকের প্রতি সমাজের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন আনা দরকার। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে যে গলদ রয়েছে, শিক্ষক যে সর্বদা এবং সর্বত্র আমাদের আশানুরূপ গুণী নন, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করতে হবে, শিক্ষকের শিক্ষা ও কৃতিত্বের মান বাড়াতে হবে, এ সব কথাও সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু আজকাল কারণে অকারণে শিক্ষাপ্রণালীর আমূল নিন্দা ও শিক্ষকের ব্যাপক অপবাদ যে ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কোন সার্থকতা নাই, এবং তাকে বন্ধ করতেই হবে। আগেই বলেছি যে এ ধরনের ব্যাপক নিন্দায় লাভ তো কিছুই হয় না বরং শিক্ষা এবং শিক্ষকের সমূহ ক্ষতি হয়। কারণে অকারণে নিন্দার ফলে শিক্ষকের উৎসাহভঙ্গ হয়, ছাত্রসমাজে অসন্তোষ এবং উদ্দেশ্যহীনতার আবহাওয়া দেখা দেয়, জনসাধারণের মনে শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষকের প্রতি বিরাগ জন্মে। শিক্ষাসংস্কারের জন্য চেষ্টা সর্বদাই করতে হবে, কিন্তু শিক্ষাপ্রণালীকে গালিমন্দ দিয়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে যে পুরাতন ও নতুন শিক্ষকের মধ্যে যেন বিরোধের সৃষ্টি না হয়। শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধরনের শিক্ষক তৈরী করতে হবে। নতুন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি উৎসাহ এবং আস্থা না থাকলে তাঁরা সফল হতে পারবেন না, কিন্তু তাই বলে পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী বা শিক্ষককে

অবজ্ঞা করলে চলবে না। শিক্ষাপ্রণালী সর্বদাই বদলায়, এবং বদলানো প্রয়োজন, কিন্তু পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতিকে একেবারে নাকচ করা অসম্ভব। যাঁরা নতুন পদ্ধতিকে গ্রহণ করিবেন, তাঁদের শিক্ষাও পুরাতন পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হয়েছে, এবং সে শিক্ষাকে হেয় জ্ঞান করলে তাঁদের নতুন শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নতুন শিক্ষকের দল হঠাৎ মাটি থেকে গজাবে না। তা ছাড়া, বহুদিন ধরে নতুন ও পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষককে পাশাপাশি কাজ করতে হবে, তাই তাদের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ বাধলে তাতে শিক্ষারই হানি হবে।

চরিত্রবান এবং বুদ্ধিমান নরনারী শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ না করলে শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা ফিরে আসবে না এ কথা সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্রসংখ্যার মধ্যে সমীচীন অনুপাত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। যতদিন শিক্ষকের তুলনায় ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক থাকবে, ততদিন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষকও বর্তমান অবস্থার পুরোপুরি প্রতিকার করতে পারবেন না। শিক্ষকের সংখ্যা তাই বাড়াতে হবে, এবং তার ফল নানা ভাবে সমাজের পক্ষে শুভ। শিক্ষকের সংখ্যা বাড়লে ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে বলে শিক্ষার মান উন্নত হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সমস্ত দেশের মনোভাবের বিপুল পরিবর্তন ঘটবে। দেশের সমস্ত বালক-বালিকার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে প্রায় ত্রিশ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। সে তুলনায় বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সংখ্যা মাত্র সাত-আট লক্ষ। কাজেই শিক্ষাকে সর্বব্যাপী করতে হলে বিশ লাখেরও বেশি নতুন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করতে হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চবিদ্যালয় এবং কলেজ-ইউনি-ভার্সিটিতে ছাত্র ও শিক্ষক-সংখ্যা বেড়ে যাবে। শিক্ষিত যুবকদের

মধ্যে বেকার সমস্যা বর্তমান ছাত্র-অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ। বিশ লক্ষ তো দূরের কথা, চার-পাঁচ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্ত করলেই দেশের শিক্ষিত বেকার সমস্যা দূর হয়ে যাবে, এবং সমস্ত দেশে এক নতুন আশ্বাস ও ভরসার আবহাওয়া গড়ে উঠবে, সমগ্র সমাজে ক্রান্তিকারী মনোবিপ্লব ঘটবে।

ভালো লোককে শিক্ষাক্ষেত্রে আকর্ষণ করতে হলে অথবা সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা বাড়াতে হলে শিক্ষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে এ কথা যেমন সত্য, কেবলমাত্র শিক্ষকের মাহিনা মাসোহারা বাড়িয়ে দিলেই যে সমস্যার সমাধান হবে না সে কথা সমান সত্য। কি করে যে শিক্ষার উন্নতি ও শিক্ষকের নেতৃত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হবে, সে বিষয়ে কিন্তু মতভেদের অন্ত নেই। কেউ কেউ মনে করেন যে শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর এক দলের বিশ্বাস যে শিক্ষকের শিক্ষাকৌশল ও ব্যবসায়িক দক্ষতা বাড়াতে পারলে সমস্যার সমাধান হবে। শিক্ষাবৃত্তির মহত্ত্বের গুণগান ও শিক্ষকের আদর্শবাদকে উদ্বুদ্ধ করেই কেউ কেউ ক্ষান্ত হতে চান। একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে এ সমস্ত ব্যবস্থার কেবলমাত্র একটি দুটি অবলম্বন করলে এ সমস্যার সমাধান হবে না, নানাভাবে নানাদিক থেকে একই সাথে নানা উপায় ব্যবহার করতে হবে। কেবল টাকার জোরে বা কর্মদক্ষতায় সামাজিক মর্যাদা আসে না। আবার খালি কথায় কারো চিঁড়ে ভেজে না।

শিক্ষকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলে যে ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, কলেজে ইউনিভা।সটিতে ঠিক সে ব্যবস্থা চলবে না। কলেজে ইউনিভার্সিটিতে সমস্যার

গুরুত্ব বেশি, অথচ শিক্ষক ও ছাত্র দুইয়েরই সংখ্যা খানিকটা কম, তাই তাদের সমস্যা নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা যাক।

অধ্যাপকবৃত্তি আজকাল যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য ব্যক্তিকে কেন আকর্ষণ করে না, তার বহু কারণের মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে আজকাল আগেকার মত আদর্শবাদী আবহাওয়া নেই, অনুকূল ভাবনার অভাবে লেখা পড়ার প্রতি অনুরাগও কমে গেছে। অন্যদিকে অধ্যাপক যে বেতন পান, তাতে স্বচ্ছলভাবে সংসার চালানো কঠিন। সমান যোগ্যতাশালী লোকের পক্ষে অন্য যে কোন ব্যবসায় বা বৃত্তিতে বহুগুণ বেশি উপার্জন এবং সামাজিক মর্যাদার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আজকাল সহজে কায়েমী-ভাবে অধ্যাপক-বৃত্তি গ্রহণ করতে চায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সঠিক আবহাওয়া ফিরিয়ে আনতে হলে প্রথমেই দলাদলি ও রাজনৈতিক কোন্দল দূর করতে হবে। সেনেটে সিণ্ডিকেটে নির্বাচন নিয়ে ঝগড়া তো লেগেই আছে, সঙ্গে সঙ্গে বহুক্ষেত্রে ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়োগ দলাদলির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি অধ্যাপকের নিযুক্তি নিয়েও দলাদলি হয়। রাধাকৃষ্ণন কমিশন এ বিষয়ে যে সব সুপারিশ করেছেন, সেগুলি কার্যকরী করলে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের আবহাওয়া অনেকখানি শোধরাবে। দলাদলি ও রাজনৈতিক মতবাদ বাদ দিয়ে যদি কেবল শিক্ষক হিসাবে উৎকর্ষের ভিত্তিতে অধ্যাপক নিয়োগ করা যায় তবে শিক্ষার মানও উন্নত হবে, শিক্ষকের মর্যাদাবোধও ফিরে আসবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সব সংস্কারে খরচ বিশেষ কিছু বাড়বে না, কেবল প্রচলিত আইনের খানিকটা রদবদল করতে হবে। মোকতে

কিন্তু ভাল জিনিষ মেলে না, তাই এ সব সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকের বেতনবৃদ্ধির ব্যবস্থাও করতে হবে। গোড়ার দিকে বেতন বৃদ্ধি বিশেষ ভাবে প্রয়োজন, কারণ প্রথম দিকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনের হার অন্যান্য রুজীর সঙ্গে তুলনীয় হয় তবে প্রথম যৌবনের আদর্শবাদে অনেকেই শিক্ষকবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট হবে। একবার শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করলে তার স্বভাবজ যে আকর্ষণ তাকে এড়িয়ে পরে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করার সম্ভাবনা অনেক কম। শিক্ষক বিলাসিতা বা আতিশয্য চায় না কিন্তু জীবন-ধারণের জন্য যা প্রয়োজনীয় সেটুকু দাবি করবার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। ভারতবর্ষে যদি আমরা শিক্ষকের এই ন্যূনতম দাবি মেটাতে পারি, তবে বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে যোগ্য ব্যক্তির অপসরণে যে শিক্ষা-সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে তা অনেক পরিমাণে দূর হতে বাধ্য।

অধ্যাপকশ্রেণীর বেতনবৃদ্ধি করতে হবে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে বেতনবৃদ্ধির পরিমাণ খুব বেশী হতে পারে না। তাই শিক্ষা-ক্ষেত্রে যাঁরা অসামান্য যোগ্যতা দেখিয়েছেন, তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। রাষ্ট্রীয় অধ্যাপকের যে কেবল বেতন বেশী হবে তা নয়, শিক্ষার বিশিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁদের নেতৃত্বও স্বীকৃত হবে। রাষ্ট্রীয় অধ্যাপকের পদ কোন বিশেষ বিদ্যালয়ে বা কোন বিশেষ বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে না। উপযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন বিষয়ে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হতে পারেন। দেশে এবং বিদেশে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, কেবল মাত্র এমন অধ্যাপকেরই নাম রাষ্ট্রীয় অধ্যাপকের

জন্য বিবেচিত হবে এবং সর্বভারতীয় নির্বাচন সমিতি সে সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

এ ধরনের রাষ্ট্রীয় অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করলেও প্রথম প্রথম তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হতে বাধ্য। কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই এ ধরনের গুণী বেশী নেই, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তো বর্তমানে একজনও মিলবে না। তবু এ ধরনের পদ সৃষ্টি হলে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষা এবং গবেষণার মান উন্নত হবে, এবং বর্তমানে যে শিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে বহু অধ্যাপক অন্যান্য বৃত্তির দিকে ঝুঁকেছেন, সে ঝোঁক অনেকখানি বন্ধ হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক জীবন সংগঠনে যাঁদের বিশেষ দান, সে ধরনের অধ্যাপকের জন্যও স্বীকৃতি চাই। আজকালকার বিরূপ আবহাওয়াতেও এমন দু চারজন অধ্যাপকের পরিচয় মেলে যাঁরা একাধারে ছাত্রসমাজের বন্ধু, হিতৈষী এবং গুরু। তাঁরা যে কেবল নিজের নিজের বিষয় বা বিভাগের ছাত্রদের জীবন গঠন করেন তা নয়—শিক্ষাসংস্থার সমস্ত ছাত্রই তাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যথাযথ স্বীকৃতি পেলে তাঁরা শিক্ষকের লুপ্ত নেতৃত্ব উদ্ধারের কাজে অনেক সাহায্য করতে পারেন। কেবল তাই নয়। বর্তমানে ছাত্র সমাজের এক বিপুল অংশ লক্ষ্যহীন ও নৈরাশ্যবাদী। এ ধরনের চরিত্রবান আদর্শবাদী অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসতে পারলে তাদের মনে নতুন চেতনা ও আশার সঞ্চার হবে।

শিক্ষাদানে যাঁদের বিশেষ দক্ষতা আছে, সে সব অধ্যাপকের জন্যও বিশেষ স্বীকৃতি চাই। আমরা অনেকেই এমন দু একজন অধ্যাপকের নাম করতে পারি বিদ্যাবত্তা বা গবেষণায় যাঁদের বিশেষ কোন কৃতিত্ব ছিল না কিন্তু কেবল শিক্ষাদানের গুণে আজো

আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। বেশ খানিকটা বিদ্যা না থাকলে শিক্ষকতা করা চলে না, কিন্তু শিক্ষকের সার্থকতা কেবলমাত্র বিদ্যার পরিমাণ দিয়ে মাপা যায় না। যে বিদ্যা শিক্ষকের আয়ত্তে, শিক্ষার্থীর মনে তাকে সঞ্চারিত করবার শক্তি দিয়েই শিক্ষকের কৃতিত্ব বিচার করতে হবে।

প্রায় সবাই মানে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি প্রধান লক্ষ্য। যে জ্ঞান আজ সমাজের আয়ত্ত, পরবর্তীদের মধ্যে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে যে পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে যে জ্ঞান আমরা লাভ করেছি, পরবর্তীদের মধ্যে তা সঞ্চারিত করা ছাড়াও যেন তার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। জ্ঞানবিতরণ ও জ্ঞানবিস্তার দুই-ই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হয়, তবে অধ্যাপকের মধ্যেও দুই শ্রেণীর লোক প্রয়োজন। একদল প্রধানত প্রচলিত জ্ঞান ছাত্র-সমাজে বিকীর্ণ করবেন, অন্যদল প্রধানত জ্ঞানের সীমানা প্রসারে আত্মনিয়োগ করবেন। এ দুটি কাজ পরস্পরবিরোধী তো নয়ই, বরং বলা চলে যে বহু ক্ষেত্রে পরস্পরনির্ভর। কিন্তু তবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে এমন অধ্যাপকের পরিচয় মিলবে যিনি প্রধানত গবেষক অথবা প্রধানত শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু প্রগতির জন্য দুই শ্রেণীর অধ্যাপকেরই প্রয়োজন আছে ও থাকবে।

বর্তমানে নানাকারণে গবেষণার প্রতি সময় সময় অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়া হয়। গবেষণার মূল্য চিরকালই থাকবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকের স্থান উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাই বলে নিছক শিক্ষকের অনাদর করা অনুচিত। শিক্ষায় দক্ষতা নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হতে পারে, কেবলমাত্র সুবিদ্বান বা সুবক্তা হলেই লোকে সুশিক্ষক হয় না। এ বিষয়ে ছাত্রদের, বিশেষ করে

প্রাক্তন ছাত্রদের বিচার প্রায়ই অভ্রান্ত। যে শিক্ষক বহু ছাত্রের মন উন্নয়ন ও মনোরঞ্জন করতে পারেন, তাঁর কৃতিত্ব মানতেই হবে। কথাটা হয়তো একটু আশ্চর্য শোনাবে, কিন্তু শিক্ষক যেমন ছাত্রদের পরীক্ষা নেন, ছাত্ররাও তেমনি মনে-মনে শিক্ষকের পরীক্ষা নেয়। শিক্ষকের বিচারে ভুল হয় হামেসা—ছাত্রদের বিচারে বড় একটা ভুল হয় না।

ব্যবসায়িক দক্ষতা বাড়াবার সুযোগও অধ্যাপককে দিতে হবে। তার অন্যতম উপায় কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষকের জন্য বৈদেশিক বৃত্তির ব্যবস্থা। বিদেশে বিশেষ অধ্যয়নের সুযোগ পেলে যে কেবল শিক্ষকের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে তা নয়, বিদেশে অধ্যয়নের আকর্ষণে অনেক তীক্ষ্ণধী নবযুবক শিক্ষাব্যবসায়ে আকৃষ্ট হবে। সবচেয়ে বড় লাভ হবে এই যে বিদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পেলে নতুন শিক্ষকের মনে শিক্ষাভাবনার এক নতুন প্রেরণা জেগে উঠবে। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকাল জ্ঞানগবেষণার আবহাওয়া ততটা সতেজ নয়। দু চারজন অধ্যাপক অবশ্য সমর্পিতপ্রাণ এবং জ্ঞানগবেষণায় নিবিষ্টচিত্ত, কিন্তু বহু শিক্ষক ও অধ্যাপক অধ্যাপনাকে জীবিকানির্বাহের একটি অবাঞ্ছিত উপায় ভিন্ন অন্য কিছু মনে করেন না। সে তুলনায় পশ্চিমের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা আজো সজীব ও প্রবল। সেখানকার বহু অধ্যাপক যে প্রগাঢ় নিবিষ্টতার সঙ্গে সত্যসাধনায় ব্রতী, তার তুলনা আমাদের দেশে বর্তমানে বড় একটা মেলে না। তরুণ বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন অধ্যাপক যদি সেই জ্ঞানসাধনার আবহাওয়ার দু-তিন বছর কাটাতে পারেন, তবে ফিরে এসে তাঁরা আমাদের

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই রকম বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবেন এ আশা অন্যায় নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক আবহাওয়া বদলের জন্য বিদেশী অধ্যাপককে এ দেশে আমন্ত্রণ করলেও লাভ হবে। যদি বিদেশের খ্যাতানামা জ্ঞানীগুণীকে তিন-চার বছরের জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে পাই, তবে তাঁদের সাধনা ও দৃষ্টান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। বার বার দেখা গেছে যে একজন শিক্ষকের প্রভাবে একটি শিক্ষয়তনের চেহারা আমূল বদলে যায়। যদি বেছে বেছে ভাল বিদেশী অধ্যাপক অল্পদিনের জন্যও আমরা আনতে পারি তবে তাতে লাভ হবে দুভাবে। একদিকে শিক্ষার মান উঁচু হবে, অন্যদিকে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বাড়তে থাকবে। এক সমন্বিত পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে যদি বিদেশী অধ্যাপককে আমন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তরুণ শিক্ষককে বিদেশে পাঠাই, তবে বিদেশী অধ্যাপক যখন স্বদেশে ফিরে যাবেন, তখন আমাদের নিজেদের লোক তাঁর স্থান গ্রহণ করে শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখতে পারবেন।

শিক্ষায়তনের আবহাওয়ার উন্নতি এবং শিক্ষকের আর্থিক অনটন দূর করা অত্যাবশ্যক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদাও বাড়াতে হবে। দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অবস্থায় শিক্ষকের উপার্জন যথাযথভাবে বাড়ানো সময়সাপেক্ষ হতে বাধ্য, তাই তাঁর সামাজিক মর্যাদা বাড়াবার ব্যবস্থা আরো বেশী জরুরী। সাম্প্রাতক জগতে সামাজিক মর্যাদা সাধারণতঃ আয়সাপেক্ষ, যে কাজে আয় যত বেশী, সে কাজের ইজ্জতও তত বেশী। অবশ্য এ নিয়মের

ব্যতিক্রমও আছে। ভারতবর্ষে মন্ত্রীদের বেতন অনেক সময় সরকারী চাকুরেদের চেয়ে কম, কিন্তু তবু মন্ত্রীদের ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশী।

রাষ্ট্রশক্তির মালিক বলে মন্ত্রীদের সামাজিক মর্যাদা, কিন্তু শিক্ষকের না আছে অর্থ, না, আছে ক্ষমতা। তাই শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা বাড়াবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ভারতীয় সমাজে এককালে ইজ্জত ও সম্ভ্রম অর্থ-নিরপেক্ষ ছিল। গরিব ব্রাহ্মণপণ্ডিত বা মৌলবী পুরাকালে যে সম্মান পেয়েছেন, বহুক্ষেত্রে ধনীর ভাগ্যে তা জুটত না। শিক্ষার সে কালে যে ইজ্জত আদর ছিল তা ফিরিয়ে আনতে পারলে শিক্ষকের ইজ্জত আপনিতেই বেড়ে যাবে।

শিক্ষকের ইজ্জত বাড়ানো আজকাল অনেক দেশেই এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন দেশ তার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছে। তুরস্কের একটি ব্যবস্থা আমাদের দেশেও কার্যকরী হতে পারে। সেখানে সরকার যখনি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়ন বা নতুন কোন কর্মধারা অবলম্বন করতে চান, প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি বিষয়টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে। রাজনৈতিক সংঘর্ষের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জড়িত নয়, অথচ শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন ও জ্ঞান রয়েছে, তাই প্রশ্নের নিরপেক্ষ ও যথাযথ বিশ্লেষণ হয়। সরকার কমিটির মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য নন, কিন্তু এ ধরনের নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞের মতামত সরকারের পক্ষে সর্বদাই লাভজনক। শিক্ষকের তাতে লাভ হয় দুভাবে। প্রথমত, সরকার সব বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ নেন বলে জনসাধারণের

চোখে শিক্ষকের ইজ্জত বেড়ে যায়। অন্যপক্ষে, বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার সমাধানে মন দিতে হয় বলে শিক্ষকের অধীত বিদ্যা কার্যকরী, সক্রিয় ও সজীব হয়ে ওঠে।

৬

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন, শিক্ষাকৌশল ও সামাজিক মর্যাদা বাড়াবার প্রয়োজন সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হল, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের বেলা তা আরও বেশী জরুরী। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের তবু খানিকটা ইজ্জত আছে। অপ্রচুর হলেও তাঁদের বেতন বহুক্ষেত্রে জীবনধারণের জন্য একেবারে অনুপযোগী নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুনের চাপে তাঁদের শিক্ষা ও দক্ষতারও একটা নিম্নমান সাধারণত নির্দিষ্ট থাকে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের বেতন বহুক্ষেত্রে তাঁর অবশ্য প্রয়োজনীয় দাবিও মেটায় না। তাঁর নিজের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ ও নিরাশাজনক। সমাজে তাঁর স্থান নিম্নতম স্তরের বাসিন্দার কাছাকাছি। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের অবস্থাও প্রায়ই অসন্তোষজনক। তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের অবস্থার ক্রান্তিকারী পরিবর্তন প্রয়োজন। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, শতকরা একজন লোক হয়তো উচ্চশিক্ষার দ্বারে পৌঁছয়, শতকরা প্রায় নিরানব্বই জন লোক কলেজের দরজা পর্যন্ত দেখেনি। মাধ্যমিক শিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের ভাগ্যেই জোটে, তাই প্রাথমিক শিক্ষকই প্রকৃতপক্ষে জাতির ভাগ্যনির্মাতা। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ যাঁর হাতে, তাঁর এ দুরবস্থা দূর করতে না পারলে সকলের জন্যই আশঙ্কার কথা।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকের বেতনের হার অবশ্যই বাড়াতে

হবে। কিন্তু এ-সমস্যার সমাধান যেমন জরুরী তেমনি কঠিন। ভারতবর্ষের কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সবশুদ্ধ ত্রিশ হাজার অধ্যাপকও হবে না, কিন্তু একমাত্র প্রাথমিক স্কুলেই প্রায় সাত লাখ শিক্ষক। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকের সংখ্যা মিলিয়ে প্রায় দশ লাখের কাছাকাছি এবং যেভাবে শিক্ষার প্রসার হচ্ছে, তাতে পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা প্রায় বিশ লাখে দাঁড়াতে বাধ্য। বেতনের হারে সামান্যতম বৃদ্ধিও তাই কোটি কোটি টাকার মামলা হয়ে দাঁড়ায়। দেশে অর্থসংকট রয়েছে সত্য, কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁরা সজাগ, তাঁরাই জানেন যে কোটি টাকা লাগলেও প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন সমস্যার সুষ্ঠু ও সত্বর সমাধান করতে হবে।

যেখানে কোটি কোটি টাকার মামলা, সেখানে শিক্ষকের বেতনের হার আশানুরূপ বাড়াতে যে সময় লাগবে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। গত পাঁচ-সাত বছরে বেতন খানিকটা বেড়েছে, কিন্তু এখনো প্রাথমিক শিক্ষক যে বেতন পান, তা শোচনীয় ভাবে কম। ভবিষ্যতেও বেতন বাড়বে, কিন্তু সে বৃদ্ধি অদূর ভবিষ্যতে যে শিক্ষককে সমাজের সচ্ছল বাসিন্দার অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে সে কথা জোর করে বলা কঠিন। বর্তমানে শিক্ষকও সচ্ছলতার দাবি করেন না, কোনরকমে খেয়ে পরে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করবার মতন সঙ্গতি হলেই অধিকাংশ শিক্ষক খুশী। এ রকম পরিস্থিতিতে বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা বাড়ানো আরো বেশী জরুরী।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত অবস্থা অনুযায়ী নানা ধরনের উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। ভারত সরকার কয়েক বছর হল যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তাতে অতি অল্প খরচে শিক্ষকের

সামাজিক মর্যাদা অনেকখানি বাড়ানো যায়। রাষ্ট্রপতিভবনে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ডাকমারফত প্রত্যেক শিক্ষককে রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণ পাঠানো হয়। যখন রাষ্ট্রপতির মোহরছাপা বিরাট লেফাপা গ্রামের ডাকঘরে পৌঁছয়, খানিকটা সাড়া পড়ে যায়—কার জন্য এ নিমন্ত্রণ ? গ্রামের লোক যখন দেখে যে এলাকার ধন ইজ্জতশালী মাতব্বর বা সরকারী চাকুরের বদলে পাঠশালায় অনাদৃত শিক্ষককেই রাষ্ট্রপতি ডেকেছেন তখন গ্রামবাসীর মনে একটা গভীর ছাপ পড়ে। প্রত্যেক প্রদেশ বা রাষ্ট্র এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন সহজেই করতে পারে। রাজ্যপাল বা প্রধানমন্ত্রী যখন সফরে বেরোন, তখন যদি প্রতি জায়গায় শিক্ষকদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা এবং সরকারী সমস্ত অনুষ্ঠানে শিক্ষকশ্রেণীর প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ করেন, তবে জনসাধারণের চোখে শিক্ষকের ইজ্জত অনেকখানি বেড়ে যাবে। শহরে ততখানি না হোক, কিন্তু গ্রামে এ ব্যবস্থার প্রভাব গভীর হতে বাধ্য। এবং যদি ভারতবর্ষের ছয় লক্ষ গ্রামে শিক্ষকের ইজ্জত বেড়ে যায় তবে তাতে সমস্ত দেশেরই লাভ।

শিক্ষকের ইজ্জত বাড়াবার আর একটি সহজ উপায় স্কুলের হেডমাষ্টারের ইজ্জত বাড়ানো। সর্বত্রই হেডমাষ্টারের উপর স্কুলের মানমর্যাদা ও কার্যকারিতা নির্ভর করে। ভালো হেডমাষ্টার অল্পদিনেই স্কুলের চেহারা ফিরিয়ে দিতে পারেন, আবার হেডমাষ্টার খারাপ হলে স্কুলের সবদিক থেকে অবনতি হয়। দু একজন ভাল শিক্ষকও স্কুলের আবহাওয়া অনেকটা ভাল করতে পারেন, কিন্তু হেডমাষ্টারের সহযোগিতা না পেলে সে কাজ দুরূহ হয়ে ওঠে।

অন্যপক্ষে হেডমাষ্টার ভাল হলে সমস্ত শিক্ষকের কার্যদক্ষতা ও উৎসাহ বেড়ে যায়। ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলের অনেক প্রশংসা শোনা যায়, এবং সে প্রশংসার কারণও রয়েছে, কিন্তু একটু খোঁজ করলেই দেখা যাবে যে পাব্লিক স্কুলের সফলতার জন্য হেডমাষ্টারই প্রধানত দায়ী।

ভারতবর্ষেও এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব নেই। বিশ-ত্রিশ বৎসর আগে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এমন দু একজন হেডমাষ্টারের নাম শোনা যেত যে তাঁদের খ্যাতি প্রদেশকে ছাড়িয়ে সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁদের স্কুলে জায়গা পেতে ছাত্রদের ভিড় লেগে যেত। আজকাল নানা কারণে সে ধরনের হেডমাষ্টারের দেখা বড় একটা পাওয়া যায় না। সে সব কারণের উল্লেখ আগেই করেছি, তার পুনরুক্তি করতে চাই না। কিন্তু তার ফলেই যে আজ দেশপ্রসিদ্ধ হেডমাষ্টারের দেখা পাওয়া যায় না সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পরাধীন ভারতবর্ষে যা সম্ভব হয়েছিল আজ স্বাধীন ভারতে কেন তা সম্ভব হবে না? পুরোনো আবহাওয়া ফিরিয়ে আনলে যে আগেকার মত চরিত্রবান, কর্মদক্ষ ও সর্বজনমানিত হেডমাষ্টারের সংখ্যা আবার বেড়ে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বেতন দিয়ে সব কিছু হয় না এ কথা যেমন ঠিক, উপযুক্ত বেতন না দিলে যে কিছুই হয় না সে কথাও সমান ঠিক। আজকাল দেশে যে আগেকার মতন উপযুক্ত হেডমাষ্টার বড় বেশী দেখা যায় না, অন্যান্য বৃত্তির তুলনায় শিক্ষাবৃত্তির আর্থিক দুর্গতি তার অন্যতম প্রধান কারণ। শিক্ষাবৃত্তিতে অন্য ধরনের আনন্দ ও সন্তোষ আছে বলে শিক্ষক কখনো ব্যবসায়ী বা উকিলের মত এত টাকা রোজগার

করতে চান না, কিন্তু ভদ্রভাবে জীবননির্বাহের সংস্থান না হলে মেধাবী ও শক্তিশালী যুবক শিক্ষাবৃত্তি কেন গ্রহণ করবে? তাই যোগ্যতা অনুযায়ী সচ্ছল জীবন যাপনের মতন বেতন হেডমাষ্টারের চাই। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে চাই যে স্কুলের কর্মপরিচালনায় যেন তাঁর সত্যিকার অধিকার থাকে। আজকাল বহুক্ষেত্রে হেডমাষ্টার স্কুলকমিটির কর্মচারী মাত্র—স্কুলের জীবন সঞ্চালনে তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের বিশেষ কোন মূল্য নেই। ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলে অন্যান্য শিক্ষকের নিয়োগ ও উন্নতি, তাঁদের কর্মসূচী নির্ধারণ, এবং ছাত্রদের পঠন ব্যবস্থা প্রভৃতি স্কুলের সমস্ত আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হেডমাষ্টার প্রায় সর্বেসর্বা। সমস্ত দায়িত্ব বহন করতে হয় বলে কি করে স্কুলের সুনাম বাড়ে, ছাত্র ও শিক্ষকদের পারস্পরিক সহযোগে স্কুলের সব দিক দিয়ে কি ভাবে উন্নতি হয়, হেডমাষ্টারও সর্বদাই সে বিষয়ে সজাগ। আমাদের দেশেও হেডমাষ্টারের কাঁধে এ ভার একবার চাপিয়ে দিলে বহু হেডমাষ্টারই যে যোগ্যতা সহকারে এ গুরুদায়িত্ব পালন করবেন, সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয় বলে ইংলণ্ডে হেডমাষ্টারের বেতন বহুক্ষেত্রে লোভনীয়। পাব্লিক স্কুলের হেডমাষ্টার কোন কোন ক্ষেত্রে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের কলেজের প্রিন্সিপালের চেয়েও বেশী বেতন পান। জাপানে দেখেছি যে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলের হেডমাষ্টার যে-বেতন পান, বড় বড় সরকারী কর্মচারীরাও ঠিক সেই বেতনই পান। তুরস্কে প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন আমাদের টাকার হিসাবে প্রায় আড়াইশো টাকা এবং তা বাড়তে বাড়তে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত পৌছে। হেডমাষ্টারের বেতন সাধারণ শিক্ষকের বেতনের চেয়ে স্বভাবতই বেশী। অন্যপক্ষে তুরস্ক সরকারের উচ্চতম পদাধিকারীর

বেতন এগারো শো থেকে পনেরো শো টাকা। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষকের উচ্চতম বেতনের তুলনায় সর্বোচ্চ পদাধিকারীর উচ্চতম বেতন মাত্র তিন গুণ। ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষকের উচ্চতম বেতন দুশো টাকার বেশী নয়। এবং তাও কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় অঞ্চলে—অধিকাংশ প্রদেশে সে বেতন একশো টাকাও নয়,—অথচ সর্বোচ্চ সরকারী কর্মচারীর বেতন চার হাজার টাকারও বেশী, বে সরকারী প্রতিষ্ঠানে কোন কোন ক্ষেত্রে বেতন তারও দ্বিগুণ তিন গুণ।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের আবহাওয়া বদলের জন্য আর একটি জিনিস প্রয়োজন। স্কুলে শিক্ষক একই বিষয় বছরের পর বছর পড়িয়ে যান তার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সে পাঠন একঘেয়ে হয়ে ওঠে। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষক সাধারণত একই বিষয়ের অধ্যাপনা করেন, কিন্তু কলেজের ছাত্রদের জানাশোনা অনেক বেশী, তাছাড়া বহুক্ষেত্রে তারা নিজেরাও অনুসন্ধিৎসু, এবং সময় সময় এমন প্রশ্ন করে বসে যে হালখবর জানা না থাকলে শিক্ষককে অপ্রস্তুত হতে হয়। তাই নিজের মর্যাদা বাঁচাবার খাতিরে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষককে নতুন নতুন বই পড়তে হয়, তাঁর পাঠ্য বিষয়ে নতুন তথ্য বা আবিষ্কারের খবর রাখতে হয়। স্কুলের শিক্ষকেরা বহুক্ষেত্রে নিজের লেখাপড়া ছেড়ে দেন, ভুলে যান যে আজীবন ছাত্র না থাকলে সার্থক শিক্ষক হওয়া যায় না। ইয়োরোপে একটা প্রবাদ আছে যে শিক্ষার ধারা জলের স্রোতের মত। যতক্ষণ নদীতে স্রোত থাকে, জল আবিল হতে পারে না। শিক্ষক যতদিন জ্ঞানসন্ধানী, তাঁর শিক্ষাও মলিন হতে পারে না। শিক্ষক যখন নিজের লেখাপড়া ছেড়ে দেন, মজা নদীর বদ্ধজলের মত তাঁর শিক্ষার ধারাও নির্জীব ও দূষিত হয়ে পড়ে।

স্কুলের শিক্ষকদের জন্য তাই বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাঁদের কাজ একঘেয়ে হয়ে না পড়ে। কর্মজীবনের মধ্যে মাঝে-মাঝে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা বা উচ্চশিক্ষার জন্য ছুটির ব্যবস্থা করলে তাতে একাধারে শিক্ষকজীবনের একটানা কাজের অবসাদ কমবে এবং শিক্ষকের কর্মদক্ষতা বাড়বে। আমেরিকায় কলেজ ইউনি-ভার্সিটির প্রফেসারের জন্যও রেওয়াজ আছে যে ছয়-সাত বছর কাজ করার পরে এক বছরের ছুটি পাওনা হয়। ছুটির বছর অধ্যাপক বা অধ্যাপিকা ইচ্ছামত লেখাপড়া বা বিদেশ ভ্রমণ করতে পারেন, এবং তার সমস্ত খরচ বিশ্ববিদ্যালয় বহন করে। কলেজের শিক্ষকের তুলনায় স্কুলের শিক্ষকের এ রকম অবসর বা শিক্ষালাভের সুযোগ আরো বেশী দরকার। দু তিন মাসের ট্রেনিংয়েও সুফল পাওয়া যায়। পাঁচ-সাত বছর শিক্ষকতা করার পরে তিন-চার মাস ছাত্র হিসাবে কাটালে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বভাবতই পরিবর্তন আসে। শিক্ষকতা করতে করতে অনেক সময় শিক্ষক ছাত্রদের পছন্দ অপছন্দের কথা একেবারে ভুলে যান—নিজে ছাত্র হিসাবে অন্যের শিক্ষকতার স্বাদ পেলে সে কথা ভোলবার উপায় থাকে না।

অল্পদিনের ট্রেনিংয়ের ফলেও শিক্ষকের দক্ষতা যে কতখানি বাড়তে পারে, মহাযুদ্ধের পরে ইংলণ্ডে তার বহু নিদর্শন দেখা গেছে। আমাদের দেশেও পুরানো শিক্ষককে তিন-চার মাসের জন্য ট্রেনিং-কলেজে এনে নতুন নতুন পদ্ধতির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করানোর ফলে তাঁদের দক্ষতা বহু পরিমাণে বেড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় তার সুফল এত স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের আর অবকাশ নেই।

কেবল প্রাথমিক নয়, মাধ্যমিক ও হাইস্কুলের শিক্ষকদের জন্যও

এ ধরনের বিশেষ শিখলাই বা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আমাদের বহুগুণ বাড়াতে হবে। বর্তমানে দেশে শিখলাইয়ের যে আয়োজন রয়েছে, তাতে বছর বছর যে সংখ্যায় নতুন শিক্ষকের প্রয়োজন, তাও পুরোপুরি মেটে না। কাজেই তার আওতায় পুরোনো শিক্ষকদের অধ্যাপনাকে ঝালিয়ে নেবার অবকাশ দেওয়া সম্ভব হবে না। তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নতুন করে করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে সেমিনার এবং শিক্ষাক্যাম্পের উল্লেখ করা প্রয়োজন। বছর কয়েক আগে ভারত সরকার হাইস্কুলের হেডমাষ্টারদের জন্য সিমলায় যে শিক্ষাক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। পঁচিশটি প্রদেশ থেকে পঞ্চাশজন হেডমাষ্টার ছয় সপ্তাহ কেবল শৈলাবাসই করেননি দেড়মাস তাঁরা যে কঠিন অধ্যয়ন এবং পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও ভাবের আদানপ্রদান করেছিলেন, তার ফলে অন্তত পঞ্চাশটি স্কুলে নতুন কার্যোদ্যম দেখা দিয়েছে। কেবল তাই নয়, একত্র বসবাসের ফলে এই প্রথম সর্বভারতীয় হেডমাষ্টার সংঘ গড়বার সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। সিমলার অভিজ্ঞতার পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কুড়ি-পঁচিশটি আঞ্চলিক সেমিনারে প্রায় বারো তেরশো হেডমাষ্টার যোগ দিয়েছেন। চার-পাঁচ বছর এ কার্যক্রম বজায় রাখলে প্রায় তিন হাজার হেডমাষ্টার এ ধরনের অভিজ্ঞতার ফলে নিজ নিজ স্কুলে নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারবেন। সর্বভারতীয় বা আঞ্চলিক শিক্ষাক্যাম্প করতে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হয় প্রাদেশিক ভিত্তিতে ক্যাম্পের আয়োজন করলে খরচ দশ হাজারও হবে না! ভারতবর্ষে এমন কোন প্রদেশ নেই যে বছরে এ বাবদ বিশ হাজার টাকা খরচ করতে পারে না। অর্থাৎ বছরে বিশ হাজার টাকা খরচ করলে

তার ফলে প্রায় একশো হাই স্কুলে শিক্ষার নতুন ধারা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে।

এ ধরনের ক্যাম্পে শিক্ষকের ব্যক্তিগত দক্ষতা তো বাড়েই, তার চেয়েও বড় লাভ হয় এই যে শিক্ষক নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে পান। সমাজ ও রাষ্ট্র তাঁর কাজের উপযুক্ত সমাদর করছে এই বোধ যখন ফিরে আসবে, তখনি শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস আবার প্রবল হয়ে উঠবে। শিক্ষাক্যাম্পে শিক্ষকের সে বিশ্বাস ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ তাঁর মেলে। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে শিক্ষাবৃত্তির আশা ও আকাঙ্ক্ষা, হতাশা ও দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান।

হেডমাষ্টারের জন্য ক্যাম্প ছাড়াও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও হাই স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকের জন্য এ ধরনের ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

শিক্ষকের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়াবার জন্য এ সব ব্যবস্থার তো প্রয়োজন আছেই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। পূর্বেই বলেছি যে শিক্ষকের কাজ যদি একঘেয়ে হয়ে পড়ে, তবে শিক্ষারও অবনতি হয়। শিক্ষকের মনে যদি আনন্দ না থাকে তবে তাঁর কাজেই বা আনন্দ আসবে কি করে? স্কুলকলেজের আবহাওয়ায় উৎসাহ ও আনন্দ না পেলে ছেলেরাও ভবিষ্যৎ জীবনসংগ্রামের জন্য উপযুক্তভাবে তৈরী হতে পারে না। আমাদের দেশে ছুটি নেওয়ার রেওয়াজ নাই বললেই চলে, ছুটি উপভোগের রেওয়াজ আরো কম। নেহাত জরুরী কাজ ভিন্ন কেউ ছুটি নিতে চায় না। অবসর ও ছুটিও যে কাজের উৎকর্ষের জন্য

প্রয়োজন, এ-কথা প্রায়ই আমরা ভুলে যাই। সমাজে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল স্তরের লোকই যদি ছুটি না নেয়, তবে শিক্ষকের বেলা ছুটি উপভোগের কথা দুরাশা মাত্র। ছুটি অবশ্য শিক্ষকের মেলে, কিন্তু সে ছুটি কেবলমাত্র কাজের মধ্যে বিরাম, তাতে চিত্তবিনোদন অথবা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবকাশ থাকে না। শিক্ষকের যে আর্থিক অবস্থা, তাতে শিক্ষক যে ছুটিতে সপরিবারে কোথাও বেড়াতে যাবেন তার বড় একটা সম্ভাবনা নেই। পূর্বে তবু ছুটিতে গ্রামাঞ্চলে যাবার রেওয়াজ ছিল, আজকাল তাও লুপ্ত হতে বসেছে। আমাদের দেশে শিক্ষকের জন্য তাই ছুটি কাটাবার বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যদি পাহাড়ে বা সমুদ্রের ধারে স্বাস্থ্যাবাস বা বিশ্রামাগার তৈরী করে সস্তায় শিক্ষককে ছুটি কাটাবার অবসর দেওয়া হয় তবে তাতে শিক্ষাব্যবস্থার বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটবে। তাতে যে কেবল শিক্ষকের স্বাস্থ্য ও উদ্যম ফিরে আসবে তা নয়, শিক্ষক বুঝবেন যে সমাজ তাঁর কাজের কদর করতে শুরু করেছে। একবার এ অনুভূতি ও বিশ্বাস ফিরে এলে শিক্ষা-প্রণালীতে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে।

স্কুল-কলেজের পরিচালনার বর্তমানে যে ঢঙ, তার ফলেও বহুক্ষেত্রে শিক্ষক নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। স্কুলে দলাদলির কথা প্রায়ই শোনা যায়। স্কুল-কলেজের কার্যকরী সমিতির সভাপতি বা সম্পাদকের পদ নিয়ে ঝগড়া কোন্দল হয়। এ সব দলাদলির ফলে হেডমাস্টার বা অন্যান্য শিক্ষক নিজের কর্তব্যপালনে একাগ্র না হয়ে কর্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টির জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। দোষ কেবল তাঁদেরও নয়। অনেক ক্ষেত্রে স্কুলকমিটির সম্পাদক বা সভাপতি স্কুলটিকে এমন ভাবে গ্রাস করে বসে যে হেডমাস্টারকে তাঁর তাঁবেদার হয়ে

থাকতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পর্যন্ত সময় সময় ব্যক্তি বা দল-বিশেষের ইজারার সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ যে ভারতবর্ষে নানাস্থানে শিক্ষাপ্রণালীর এত নিন্দা শোনা যায়, স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যক্তিপ্রভুত্ব তার অন্যতম কারণ।

সমস্ত ব্যাপারটাই খানিকটা অদ্ভুত, কারণ বহুক্ষেত্রে গণতন্ত্রের নামে এ স্বৈরাচারের উদ্ভব। বলা হয় যে স্কুলকমিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে সমস্ত সদস্যকে নির্বাচিত হতে হবে। যেখানে নির্বাচন, সেখানেই দলাদলি। তাই নির্বাচনের নামে গোষ্ঠী ও দলবন্দী শুরু হয়ে যায়। বর্তমান যুগে নির্বাচন একেবারে বাদ দেওয়া চলে না, কিন্তু তাই বলে স্কুল-কলেজগুলিকে দলাদলির স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়াও যায় না। আমেরিকায় নিউইয়র্ক স্টেটে শিক্ষাব্যাপারে নির্বাচিত সংঘ সর্বেসর্বা। কিন্তু নির্বাচনের পদ্ধতি এমন যে দলাদলির বড় একটা অবকাশ নেই। শিক্ষাসংঘের সদস্য তেরজন, কিন্তু প্রতি বৎসর মাত্র একজন সদস্যের নির্বাচন হয়, এবং প্রত্যেক সদস্যের মেয়াদ তের বৎসর। নির্বাচনের সময় খানিকটা দলাদলির গন্ধ থাকলেও দু চার বছরের মধ্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সদস্য সে পুরাতন দলাদলি ভুলে যান। আইনসভার সদস্যদের মেয়াদ মোটে দুই বছর। আর স্টেটের লাটসাহেবের কার্যকাল চার বছর, তাই শিক্ষাসংঘের সদস্য তিনজন লাট এবং ছয়দল আইনসভার সদস্য বদল হতে দেখেন। তার ফলে সদস্য নির্বাচনের দু এক বছরের মধ্যেই লাট বা আইনসভার শিক্ষাসংঘের উপরে বিশেষ কোন প্রভাব থাকে না।

যে সব ব্যবস্থার কথা এ পর্যন্ত বলেছি, সেগুলি অবলম্বন করলে ফল অবশ্যই হবে, কিন্তু শিক্ষার সত্যিকার উন্নতি এবং শিক্ষকের নেতৃত্ব ফিরিয়ে আনতে হলে প্রাইভেট-মাস্টারি বন্ধ করা সর্বাগ্রে

প্রয়োজন। যে মুহূর্তে শিক্ষক ছাত্রের বাড়ি চাকুরি করতে স্বীকার করেন, সেই মুহূর্তে গুরুশিষ্যের সম্পর্কের স্থানে চাকর-মনিবের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। স্কুলেও শিক্ষক বেতন পান, কিন্তু সে বেতন কোন ব্যক্তিবিশেষের হাত থেকে নিতে হয় না। ছাত্রেরা সকলেই স্কুল-কলেজের মাহিনা দেয়, সে অর্থ একত্রিত হয়ে যে বিত্ত, শিক্ষক অধ্যাপকের বেতন সেই সম্মিলিত অর্থভাণ্ডার থেকে দেওয়া হয়। প্রাইভেট মাস্টারিতে ব্যবস্থা একেবারে অন্য রকম। বিশেষ ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে তার ছেলেকে পড়াবার প্রতিদানে তার হাত থেকে অর্থগ্রহণের সঙ্গে স্কুলের বেতনের কোন তুলনাই হতে পারে না। ক্লাসে না পড়িয়ে প্রাইভেট মাস্টারির উপর বেশী ঝোঁক দেওয়ার ফলে স্কুলের শিক্ষাদানের যে অবনতি, তার আলোচনা পূর্বেই করেছি এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

প্রাইভেট মাস্টারি বন্ধ করতে হবে একথা সবাই মানে। স্কুলে কলেজে নিয়মও রয়েছে যে হেডমাস্টার বা প্রিন্সিপালের অনুমতি না নিয়ে কেউ টিউশানি করতে পারবে না। কিন্তু যতদিন শিক্ষকের আর্থিক দুর্গতি দূর না হবে, ততদিন এ সব কাগজী নিয়ম দিয়ে এ দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না। টিউশানির সমস্ত গলদ স্বীকার করেও শিক্ষক শেষে এই কৈফিয়ত দেন যে স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাঁচতে হলে টিউশানি না করে উপায় নেই। শিক্ষকের বেতন বাড়ানো যে সমস্ত সংস্কারের গোড়ার কথা, সে কথা কি অস্বীকার করা চলে? জীবনযাত্রা সুষ্ঠুরূপে নির্বাহের জন্য যে বেতন প্রয়োজন, তা যখন স্কুল কলেজে দেওয়া হবে, তখন টিউশানি বন্ধ করার নিয়ম নিয়েও কড়াকড়ি করা চলবে। যতদিন বেতন এবং চাকুরির অন্যান্য শর্তের যথাযথ উন্নতি না হয়, ততদিন পর্যন্ত হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেও

চলবে না, সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে টিউশানির প্রধান প্রধান গলদগুলি দূর করবার চেষ্টা করতে হবে।

স্কুলের আওতায় স্কুলঘরে হেডমাস্টারের কর্তৃত্বাধীনে টিউশানির ব্যবস্থা করলে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে টিউশানি বন্ধ হয়ে যাবে। স্কুলে ভাল করে পড়ানো হয় না অথবা কোন কোন ছাত্র ক্লাসের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না অথবা কোন অভিভাবক ভাবেন যে প্রাইভেট মাস্টারের কাছে বিশেষ ভাবে পড়লে তাঁর ছেলে পরীক্ষায় বেশী ভাল করবে বলেই টিউশানির প্রয়োজন হয়। স্কুলে টিউশানির ব্যবস্থা করলে সে প্রয়োজন সহজেই মিটবে এবং শিক্ষকদের মধ্যে অন্যায় প্রতিযোগিতা অনেকখানি বন্ধ হয়ে যাবে। তার জন্য আর একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন। স্কুলে টিউশানির বাবদ যে মাহিনা উসুল হবে, সমস্ত শিক্ষকেরই তাতে ভাগ থাকবে অবশ্য যাঁরা সেজন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন, তাঁদের ভাগ স্বভাবতই একটু বেশী হবে। সমস্ত শিক্ষককে ভাগ না দিলে হেডমাস্টারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ উঠতে পারে, যাঁরা বাদ পড়ে যাবেন তাঁরা গোপনভাবে বাড়ি বাড়ি টিউশানি শুরু করতে পারেন।

একবার টিউশানিকে স্কুলের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারলে বর্তমান পরিস্থিতির একটি প্রধান সংকট দূর হবে। শিক্ষক যদি তাঁর সমগ্র সময়, উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে ক্লাসে পড়াতে শুরু করেন, তার স্কুলের আবহাওয়া একেবারে বদলে যাবে। এই একটি পরিবর্তনের ফলেই শিক্ষাপ্রণালীতে বিস্ময়কর উন্নতি দেখা দেবে, শিক্ষকও হারানো নেতৃত্ব ফিরে পাবেন।

স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পূর্ব মর্যদা ফিরে পেলে বর্তমান শিক্ষা-সমস্যার অনেকখানি সুরাহা হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যে সব সমস্যার সমাধান প্রয়োজন, ছাত্রদের অর্থচিন্তা দূর করা তার মধ্যে অন্যতম।

বর্তমানে ছাত্রদের যে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়, রাতারাতি অবশ্য তার প্রতিকার করা সম্ভব নয়। সমাজের ব্যাপক অর্থ-সংকটের অবসান না হলে কেবল ছাত্রদের জন্য কোন সমাধানও সহজে মিলবে না। যতদিন জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অবনত থাকবে, ততদিন শিক্ষায়তনের অবস্থা সন্তোষজনক হতে পারে না। সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সময়সাপেক্ষ, তাই ছাত্রদের অর্থসমস্যা দূর করতেও সময় লাগবে, কিন্তু তাই বলে হাত পা ছেড়ে বসে থাকা বিপজ্জনক। শিক্ষায়তনের যে সব অসুবিধা বা আর্থিক অনটনের জন্য শিক্ষা পুরোপুরি কার্যকরী হচ্ছে না, তার সবগুলি না হলেও প্রধান বাধাগুলি দূর এবং সাধ্যমত উন্নতির জন্য চেষ্টা করতেই হবে। এ সমাস্যার সমাধানের জন্য বহুমুখীন এবং বহুব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, তার পুরো ফিরিস্তি দেওয়া স্বল্পায়তন প্রবন্ধে সম্ভব নয়। মোটামুটি যে কয়েকটি ব্যবস্থার উল্লেখ করতে চাই তার অধিকাংশই অর্থসাপেক্ষ। কিন্তু কোনটিতেই খরচের পরিমাণ খুব বেশী নয়।

দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের জন্য শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা সমাজের নিজ স্বার্থের জন্য প্রয়োজন। যদি অর্থের অভাবে প্রতিভাশালী ছেলেমেয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, তবে তাতে সমাজের সমূহ ক্ষতি। নেতৃত্ব করবার মতন লোক কোন

সমাজেই খুব বেশি নেই, তাই দারিদ্র্যের দরুন যদি নেতৃত্বগুণশালী যুবক শিক্ষার সুবিধে না পায়, তবে সমাজের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দুর্বল হতে বাধ্য। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রের শিক্ষা-সমস্যা বেশী কঠিন, কিন্তু স্কুলের ছেলেমেয়েদের জীবনেও বহু ক্ষেত্রে এ সমস্যা দেখা দেয়। আজকাল অবশ্য জলপানি, বৃত্তি, স্কলারশিপের ব্যবস্থা খানিকটা হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত কম। স্কুল-কলেজের শতকরা পনেরো-কুড়ি জনের বেশি বৃত্তিভোগী নয়, এবং বহুক্ষেত্রে বৃত্তির অর্থে পড়াশোনার সব খরচ কুলায় না। ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষের তুলনায় বহুগুণে ধনী, সেখানে জনপড়তা আয় আমাদের দেশের দশগুণেরও বেশি, অথচ সে দেশে বৃত্তির সংখ্যা এ দেশের চেয়ে বহুগুণ বেশি এবং বহুক্ষেত্রেই বৃত্তির অর্থে শিক্ষার সমস্ত খরচ—মায় খোরাক-পোশাক—কুলিয়ে যায়। ভারতবর্ষে শতকরা কুড়িটি ছেলের বৃত্তি মেলে না, অথচ অক্সফোর্ডের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা আশীজন বৃত্তিভোগী। সারা ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তিনজনের মধ্যে দুইজন রাষ্ট্র বা সমাজের সাহায্যনির্ভর।

আমাদের দেশে রাষ্ট্র এবং সমাজেরও অর্থের অনটন, তাই হয়তো ঠিক ইংল্যাণ্ডের মত একটা সাহায্য দেওয়া বর্তমানে সম্ভব হবে না, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ইংল্যাণ্ডের তুলনায় ভারতবর্ষে সরকারী সাহায্য আরো বেশি জরুরী। বর্তমানে যে মাত্র শতকরা পনেরো-কুড়িটি ছাত্র আংশিক সাহায্য পায়, সে ব্যবস্থার প্রতিকার করতেই হবে। সমাজের অর্থসংকোচের জন্য যদি প্রয়োজনীয় সাহায্যের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা কঠিন মনে হয়, তবে অন্য ব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে।

বর্তমানে যারা সরকারী বৃত্তি পায়, তারা পরজীবনে সমৃদ্ধিশালী হলেও সে বৃত্তির অর্থ ফিরিয়ে দেবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের অর্থাভাবের কথা স্মরণ করে এ ব্যবস্থার খানিকটা বদল করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। যদি এ রকম নিয়ম করা যায় যে যারা বৃত্তি জলপানি পাবে, তারা পরবর্তী জীবনে দশ বছরের জন্য নিজের আয়ের একটি অংশ বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের বৃত্তিভাণ্ডারে দান করবে, তবে সেই অর্থ দিয়ে বৃত্তিসংখ্যা বাড়ানো চলতে পারে। কে কি পরিমাণ ফিরিয়ে দেবে, আয় অনুসারে তারও ফিরিস্তি করা যেতে পারে। যাদের উপার্জন কম, তারা হয়তো আয়ের শতকরা পাঁচ টাকা, যাদের উপার্জন বেশী, তারা শতকরা দশটাকা ফিরিয়ে দিলে বৃত্তিভাণ্ডারে নেহাত কম টাকা মজুত হবে না। যাদের উপার্জনে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চলা কঠিন তাদের জন্য একটি নিম্নমান নির্দেশ করা দরকার। তাদের বেলা এ নিয়মের ব্যতিক্রম করলে কারো কোন আপত্তির কারণ থাকবে না।

বৃত্তিকে ঋণ মনে করা ছাড়া অন্য উপায়ের কথাও ভাবা যায়। আমেরিকায় বহু ছাত্র নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জন ও শিক্ষার অর্থব্যবস্থা করে থাকে। শিক্ষাপ্রণালীর যে ধারা, তাতে জীবিকা অর্জন ও উচ্চ শিক্ষালাভ একসঙ্গেই করা সম্ভব। তারা অনেকেই নিজেদের স্কুল-কলেজে দফতরী পিওনের কাজ, লাইব্রেরিতে বই লেনদেন বা রান্নাঘরে যোগান দেওয়া বা রান্নার কাজ করে, বাইরে অন্যের বাড়িতে বা দোকানে হোটেলে নানা ধরনের কাজ করে এবং এমনি ভাবে নিজেদের লেখাপড়ার খরচ যোগায়। ভারতবর্ষেও স্কুল-কলেজে গরিব ছাত্রদের জন্য পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে স্কুল-কলেজের ঘরবাড়ি ও পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের পরিকল্পনার বিশেষ মূল্য আছে। সবাই মানে যে বর্তমানে বহুক্ষেত্রে স্কুল-কলেজের ঘরবাড়ি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। আলোবাতাস ভালভাবে খেলে না, খেলাধূলার মাঠময়দান নেই, লাইব্রেরি বা বিশ্রামঘরের অনেক জায়গায় কোন হদিসই মেলে না। একটু ঘাসের লন, একটু বাগান—এ সব জিনিসকে তো সময় সময় বিলাসিতা মনে করা হয়! অর্থের অভাবে এ সমস্ত প্রয়োজনীয় দাবি মেটানো কঠিন, কিন্তু যদি স্কুল-কলেজের ছাত্রদের এ সব গঠনমূলক কাজে লাগানো যায়, তবে তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মরবে। একপক্ষে ছাত্রদের সম্মিলিত চেষ্টায় অতি অল্পখরচে মাঠময়দান হবে, স্কুল-কলেজের ঘর-বাড়ির উন্নতি হবে, অন্য পক্ষে এ পরিশ্রমের বিনিময়ে ছাত্রেরা স্কুল-কলেজের ফি এবং অনেক ক্ষেত্রে খোরাক পোশাকের ব্যবস্থা করতে পারবে। এ ভাবে যে বিদ্যায়তন গড়ে তোলা যায়, এ-দেশেও তার নিদর্শনের অভাব নেই। সাতারা জেলায় ভাওরাও প্যাটেলের নেতৃত্বে রায়ত শিক্ষণসংস্থা ছাত্রদের মেহনত দিয়ে একটি কলেজে, চারটি ট্রেনিং স্কুল এবং বহু উচ্চ এবং প্রাথমিক স্কুল তৈরী করেছে। শতশত গরিব ছাত্র বিনাপয়সায় লেখাপড়ার স্থযোগ পেয়েছে। সাতারায় যা সম্ভব হয়েছে, ভারত-বর্ষের অন্য অঞ্চলেও তা হতে পারে।

এ ধরনের গঠনমূলক কাজে ছাত্রদের আর্থিক সমস্যার খানিকটা সমাধান হবে। স্কুল-কলেজে ঘরবাড়ির উন্নতি, নানা ধরনের নতুন আয়োজনের ব্যবস্থাও সম্ভব হবে। কেবল তাই নয়, শিক্ষকের নেতৃত্বে পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করবার শিক্ষার ফলে ছাত্রদের সামাজিক জীবনে উৎকর্ষ এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সঞ্চার হবে।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের সহযোগিতা যে কত প্রয়োজনীয় সে কথা বলা বাহুল্য। নিজেদের স্বল্পায়তন পরিবেশে এ ধরনের গঠনমূলক চেষ্টার সহজ পরিণতিতে ছাত্রদের মনে সমাজ সেবার মনোবৃত্তি গড়ে উঠবে। ছাত্রেরা যখন দেখবে যে নিজেদের চেষ্টায় স্কুল-কলেজের পরিবেশের উন্নতি করা সম্ভব, তখন স্থানীয় পরিবেশের উন্নতির পবিকল্পনাও সহজেই গ্রহণ করতে পারবে। আজকাল প্রায়ই বলা হয় যে ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে আদর্শবাদের হ্রাস হয়েছে, কথাটি যে পুরোপুরি সত্য তা মনে করবার কারণ নেই কিন্তু যারা এ রকম অপবাদ দিয়ে থাকে, তারাও ছাত্রদের করণীয় কাজ সম্বন্ধে কিছু বলে না। যদি যুব ও ছাত্রসম্প্রদায়ের জন্যে উপযুক্ত লক্ষ্য ও কার্যক্ষেত্র নির্দেশ করে দেওয়া যায়, তবে তারা যে সে আহ্বানে সাড়া দেবে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই। নিজের শহর বা গ্রামের পরিবেশের উন্নতি-পরিকল্পনায় একদিকে ছাত্রদের বিপুল উদ্যমের সদ্ব্যবহার হবে, অন্যপক্ষে সমাজের সঙ্গে তাদের একাত্মবোধের উপলব্ধি গভীরতর হবার সুযোগ পাবে।

আজকালকার ছাত্রদের আদর্শ ও লক্ষ্যহীনতার কথা যে বলা হয়, সে কথা হয়তো খানিকটা সত্য, কিন্তু সমাজ এবং অভিভাবকবৃন্দ তার জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন সর্বত্রই চায় যে কিশোর ছাত্র স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে কলেজে ভর্তি হোক। ছাত্র নিজে তা চায় কিনা, উচ্চশিক্ষার যোগ্যতা বা উচ্চশিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ রয়েছে কিনা এ সব বিচার না করেই দাবি করা হয় যে প্রত্যেকের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যবস্থার একমাত্র ফল এই যে বর্তমানে বহু ছাত্রছাত্রী উদ্দেশ্যহীনভাবে ছাত্র-জীপন যাপন করে। শৈশবে ও কৈশোরে শিক্ষালাভ প্রত্যেকের

জন্মগত অধিকার হতে পারে, গণরাজ্যের নাগরিক হিসাবে প্রাথমিক, এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষাও সকলের জন্য প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু উপযোগিতা বা অধিকারের প্রশ্ন উপেক্ষা করে সকলের জন্য উচ্চশিক্ষার দাবির কোন যৌক্তিকতা নেই। যে-সব যুবকযুবতী জ্ঞানান্বেষী, অথবা উচ্চশিক্ষার প্রতি স্বভাবত আগ্রহশীল, তাদের জন্য অবশ্যই উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু পড়াশোনায় মন থাক বা না থাক, উচ্চশিক্ষা গ্রহণের শক্তি থাক বা না থাক, মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী যে গড্ডলিকাপ্রবাহে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে চায়, সমাজের কল্যাণে তার প্রতিকার প্রয়োজন। বহুক্ষেত্রে অন্য কিছু করার নেই বলেই ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তি হয়, কিন্তু কেবল সময় কাটাবার জন্য এ ব্যবস্থা যে জাতি ও দেশের পক্ষে হানিকর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এ অবস্থার প্রতিকার করতে হলে শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে ছাঁট-বাছাই করা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হবে, কিন্তু শতকরা বিশ-পঁচিশ বা ত্রিশজনের জন্য মামুলি মাধ্যমিক শিক্ষা উপযোগী হলেও বাকি শতকরা সত্তরজনের জন্য নিষ্প্রয়োজন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হানিকর। শতকরা এ সত্তর জনের জন্যও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্য করতে হবে। শিল্পকলা, বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রভৃতি নানা ধরনের শিক্ষা ও শিক্ষানবিশির প্রচলন করতে পারলে অনেক ছাত্রই এ-সমস্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়বে। তাতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের ভিড় কমবে, উচ্চশিক্ষার মান উন্নত করা সহজ হবে এবং লক্ষ-লক্ষ যুবক-যুবতী নিষ্ফল সময় যাপনের বদলে কার্যকরী ও সার্থক শিক্ষালাভ করবে। এ প্রসঙ্গে ভারত সরকারের একটি সাম্প্রতিক পরিকল্পনার উল্লেখ করা যেতে

পারে। বর্তমানে প্রায় সমস্ত সরকারী বেসরকারী কাজের জন্যেই ডিগ্রীর দাবী করা হয় বলে বহু ছাত্র ইচ্ছার অনিচ্ছায় কলেজে ভর্তি হয়। এ ব্যবস্থার পরিবর্তে সরকারী চাকুরির একটি বিপুল ক্ষেত্রে সতেরো বছরের বেশি কিন্তু উনিশ বছরের কম যুব-সম্প্রদায়কে চাকুরিতে নিয়োগ করলে তার সুফল নানা দিক দিয়ে দেখা দিতে পারে। তাই সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ-ব্যবস্থা পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা চলছে এবং আশা করা যায় যে, দু এক বছরের মধ্যে ভারত সরকার এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার এ বিষয়ে একটি সুচিন্তিত ও সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

যতদিন এ বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত না মেলে, ততদিন কেবল হাতপা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। স্কুল কর্তৃপক্ষেরও এ বিষয়ে গুরু দায়িত্ব রয়েছে। ছেলেমেয়েরা সবাই স্কুলে সাত-আট বছর কাটাবে, এবং নানাভাবে শিক্ষক তাদের যোগ্যতা, পছন্দ অপছন্দ, রুচি ও কৃতিত্বের পরিচয় পাবেন। বস্তুতপক্ষে, মা-বাপের চেয়েও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর বিবেচনা বহু ক্ষেত্রে বেশি নির্ভরযোগ্য। বাপমা নিজের ছেলেমেয়ের সম্বন্ধে সর্বদা সুবিচার করতে পারেন না। স্নেহের চোখে তাদের দোষগুলি ছোট হয়ে দেখা দেয়, গুণগুলি আরো বেশি উজ্জ্বল মনে হয়। স্নেহের দৃষ্টি না থাকলেও বিচার চলে না। তাই অপরিচিত অবান্ধব গুণগুলিকে ছোট ও দোষগুলিকে বড় করে দেখে। শিক্ষকের ছাত্রের প্রতি স্বভাবজ স্নেহ থাকবে, কিন্তু মা-বাপের মত আত্মজ প্রীতি দৃষ্টিকে রঙীন করে তুলবে না। তাই প্রাথমিক শিক্ষার শেষে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে শিক্ষকের পরামর্শ মূল্যবান। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে সে পরামর্শের প্রয়োজন আরো বেশি। এ কথা সবাই মানে কিন্তু ছাঁট-বাছাই

করবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় এ বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ভারতীয় পরিকল্পনা আজো কার্যকরী হয়নি।

ছাঁট-বাছাইয়ের পদ্ধতি ও রীতি নিয়ে ব্যর্থ বাদানুবাদও হয়েছে। বিলেতে এবং আমেরিকায় এ সব পদ্ধতির পরীক্ষা শুরু হয় কিন্তু সেখানেও পণ্ডিতজন এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি। বিলেতে এক সময় নিয়ম হয়েছিল আজও সে নিয়ম বহুলাংশে চালু রয়েছে যে এগারো বছর পুরো হলেই ছেলেমেয়ের ছাঁটবাছাই, এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভিন্ন ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা হত। বাকি ছেলেমেয়েরাও পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শেখে। কিন্তু সে শিক্ষাধারাকে খানিকটা নিচু বলে সবাই মেনে নেয়। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হয়েছে অনেক এবং বহু অভিজ্ঞ শিক্ষক এগারো বছরের শেষে এ রকম চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে অন্যায় এবং অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছেন। সে পদ্ধতির অনেক সংস্কারও হয়েছে কিন্তু তার একটি প্রধান গুণের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের জন্য যে পরীক্ষা, তার দোষত্রুটি যতই থাক না কেন, বংশমর্যাদা বা টাকাপয়সার হিসাবের বদলে এ ধরনের পরীক্ষার ফলে মেধাবী ছাত্রের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় বলে তরফদারি বা অবিচারের সম্ভাবনা তাতে অনেক কম। হিসাবে একটু আধটু ভুলচুক হতে পারে কিন্তু কোনও উপযুক্ত ছাত্রকে বঞ্চিত করে অযোগ্য ছাত্রের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থার বিড়ম্বনা তাতে অনেকখানি বন্ধ হয়ে যায়।

আমেরিকায় ছাঁটবাছাই নিয়ে বিচার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তাতে সুফল মিলেছে, কিন্তু বাড়াবাড়িও হয়েছে অনেক।

এমন মতেরও প্রকাশ সে দেশে দেখা যায় যে অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ, মনোবৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাধারা নির্ণয় করা অসম্ভব। আমেরিকার মত ঐশ্বর্যশালী দেশেও প্রত্যেকটি প্রাথমিক স্কুলে এ রকম মণিকাঞ্চন সংযোগ অসম্ভব, ভারতবর্ষের মত দেশে তার কল্পনা বাতুলতা। তাছাড়া এ ধরনের আড়ম্বরের বিশেষ কোন প্রয়োজনও নেই। মনো-বৈজ্ঞানিক যতই জ্ঞানী-গুণী হোন না কেন, কোন কিশোর বা বালককে মাত্র ঘণ্টাখানেক দেখে তার রুচি বা শক্তি সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করবেন এ আশা করা অন্যায়। প্রত্যেকটি ছাত্রের জন্য সারা বছর ধরে এক-একজন মনোবৈজ্ঞানিক নিযুক্ত করা হবে এ রকম ব্যবস্থার দাবিও অবাস্তব। সাত-আট বছর ধরে দিনের পর দিন ছাত্রের লেখাপড়া, তার ব্যবহার ও তার বিকাশ দেখেও যদি শিক্ষক তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে না পারেন, শিক্ষকের পক্ষে তা একান্ত লজ্জার কথা। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রের বাপ-মা অভিভাবক পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে সুবুদ্ধি দিতে পারেন, এবং এ ভাবে ছাত্রের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণীত হলে তাতে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই মঙ্গল।

ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন না করে এ রকম পরামর্শ দেওয়া অসম্ভব। আজকাল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচয় বা অন্তরঙ্গতা দূরের কথা, বহুক্ষেত্রে শিক্ষক ছাত্রের নাম পর্যন্ত জানেন না এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাত্রেরাও শিক্ষকের নামের আদ্যাক্ষর জেনেই তুষ্ট। কলকাতার কলেজের ছাত্রদের মধ্যে "পি সি" এবং "কে সি বি"র বক্তৃতার তুলনামূলক সমালোচনা শোনা গেছে, কিন্তু "পি সি" পঞ্চানন চক্রবর্তী না পরিতোষ চাকলাদার,

"কে সি বি" কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য না কালীচরণ ব্যানার্জি সে সম্বন্ধে কোন হদিস মেলেনি। নৈর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের দোষগুণ অন্যত্র যাই থাক না কেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের নৈর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের স্থান নেই। শিক্ষা একান্ত ভাবে ব্যক্তিনির্ভর, শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শ যদি ছাত্রের মনে না লাগে, তবে শিক্ষার কাঠামো খাড়া করা যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে না।

বিদেশে কোথাও কোথাও রেওয়াজ আছে যে আট-দশজন ছাত্রকে এক-একজন শিক্ষকের হাওলা করে দেওয়া হয়। শিক্ষক যে কেবল তাদের লেখা-পড়া সম্বন্ধে খোঁজ রাখেন তা নয়, তারা কোথায় কি ভাবে থাকে, অবসর বিনোদন কি ভাবে করে, তাদের বন্ধুবান্ধব কারা, সে সম্বন্ধেও তাঁকে খোঁজ রাখতে হয়। তাদের অসুখে-বিসুখে বিপদে-আপদে সব রকম সাহায্য করতে হয়। এ ব্যবস্থার যে ত্রুটি নেই, তা নয়—শিক্ষক অনুদার, অসহনশীল বা অদরদী হলে ছাত্রদের অনেক বিড়ম্বনা হতে পারে কিন্তু শিক্ষক যদি বুদ্ধিমন্ত হৃদয়বান হন, এবং বাপমা ও অভিভাবকদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে নিজের কর্তব্যপালন করেন, তবে ত্রুটিগুলি শুধরে যাবে এবং শিক্ষক-ছাত্রের ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের ফলে শিক্ষার্থী সবদিক দিয়ে লাভবান হবে। শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক আজ শিথিল হয়ে গেছে, তাকে সজীব ও নিবিড় করতে চাইলে যদি খানিকটা বিপদের সম্ভাবনা আসে, তবে সে বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে।

একবার এ ধরনের ছাঁটবাছাই ব্যবস্থা প্রচলিত হলে শিক্ষার উচ্চস্তরে সংখ্যা সমস্যার সমাধান অনেকখানি সহজ হয়ে আসবে। পূর্বেই বলেছি যে বর্তমানে ডিগ্রীর উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়া

হয় বলে অধিকারী অনধিকারী সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ভিড় করে। সরকারী তরফ থেকে সে ব্যবস্থা বদলের চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু সরকার এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তই করুন না কেন, শিক্ষার আদর্শের খাতিরে উচ্চশিক্ষার প্রার্থীসংখ্যা পরিমিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা পরিমিত করতে হবে, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে কলেজে ইউনির্ভাসিটিতে ছাত্রসংখ্যা কমবে। এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা পরে করেছি। এখানে কেবল এইটুকু বললেই চলবে যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যে ভাবে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুণগত বাছাইয়ের উপর জোর না দিলে সংখ্যাপ্লাবনে উচ্চশিক্ষা একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে। যদি প্রাথমিক শিক্ষার শেষে কেবলমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠিতে মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, এবং বিভিন্ন ধরনের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ছাত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষার আয়োজন করা যায়, তবে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে উদ্দেশ্যহীন ছাত্রদলের গড্ডলিকাপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এই একই রীতি মেনে নিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্বাচন যদি কেবলমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে করা হয়, তবে বর্তমানের অনুশাসনহীনতা যে সত্বর নিয়ন্ত্রিত হয়ে দিনে দিনে শেষ হয়ে আসবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

যোগ্যতা অনুসারে ছাঁট-বাছাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের শিক্ষার ভার সমাজ ও রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে সুবিচারের বদলে অবিচারের আশঙ্কা আরো প্রবল হয়ে উঠবে। বর্তমানের নৈরাজ্যমূলক ব্যবস্থায় সবাই এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ভিড় করে, দরিদ্র ছাত্রও কায়ক্লেশে

কোনরকমে নিজের স্থান করে নেয়, কিন্তু যে মুহূর্তে রাষ্ট্র স্থির করবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী ছাত্র গ্রহণ করা হবে না, সেই মূহূর্তে রাষ্ট্রকে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে অর্থাভাবে উপযুক্ত ও মেধাবী ছাত্র যেন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। এ কথা এত স্পষ্ট যে এ বিষয়ে আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন।

ছাত্রসমাজের আথিক দুর্গতি এবং তার ফলে যে মানসিক সঙ্কোচন তা দূর করবার জন্য আর একটি ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়। বিলেতে বর্তমানে স্কুলের সব ছেলেমেয়েই স্কুল থেকে ইউনিফর্ম এবং দুপুরবেলা খেতে পায়। যে সব ছাত্রছাত্রীর অবস্থা স্বচ্ছল, তাদের বাপ-মা খোরাক-পোশাকের খরচ দেন কিন্তু স্কুলের হেডমাস্টার বা কর্তৃপত্র ছাড়া আর কেউ সে কথা জানেন না। ছেলেমেয়েরা জানে যে তারা সবাই স্কুল থেকে পোশাক এবং মধ্যাহ্নভোজন পাচ্ছে। তার ফলে সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে সমভাব, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বেরাদরী গড়ে ওঠে। এক ধরনের কাপড় পরলে যে কি রকম একাত্মবোধ সৃষ্টি হয় তার নমুনা আমরা প্রতিদিন ফৌজি কারবারে, পুলিশের কার্যকলাপে, খেলোয়াড়ী টিমের খেলাধূলায় দেখতে পাই। স্কুলের তরুণ ছাত্রছাত্রীদের মনে এ ধরনের এক পোশাক এক সাজ আরো বেশি দাগ কাটে।

আজকাল প্রায়ই বলা হয় যে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার বাড়িয়ে ছাত্রদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে স্কুলের খরচ অন্তত খানিকটা মেটাতে হবে। আমার বিশ্বাস যে শিক্ষার মোটা-মোটা খরচের বিষয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে যদি বুনিয়াদী শিক্ষার যেটুকু আয় তা ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের খোরাক-পোশাকে ব্যয় হয়, তবে

সত্যিকার সুফল দেবে। আজকাল যে সব ছেলেমেয়ে দূর থেকে স্কুলে আসে, তারা সকালে খেয়ে বেরোয়, আবার বিকালে বাড়ি ফিরে খায়। সারাদিন অভুক্ত অনাহারী ছাত্রের পক্ষে লেখাপড়া বা খেলাধূলা কোনটিতেই ঠিকভাবে মন দেওয়া সম্ভব নয়। যাদের অবস্থা স্বচ্ছল, তারা টিফিন খাবে এবং যারা গরিব তাদের টিফিন জুটবে না—এ ব্যবস্থা অন্যায় এবং অকল্যাণ-প্রসূ। সামাজিক একাত্মবোধ তাতে খিন্ন হয়ে পড়ে এবং পরজীবনের অনেক বড় বড় গলদের শুরু এমনি ছোট-ছোট ত্রুটি থেকে আরম্ভ হয়। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলনের ফলে যদি স্কুলের সমস্ত ছেলেমেয়ে একই ধরনের পোশাক পরতে পারে, একই ধরনের টিফিন খেতে পায়, তবে বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যান্য বড় বড় সুবিধা ও গুণ না থাকলেও এই একমাত্র কারণে বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের ছাত্রসমাজে ক্রান্তিকরী পরিবর্তন এনে দিতে পারে

৮

পূর্বেও বলেছি যে আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীকে এক কথায় বরখাস্ত করে দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা। এ রকম চেষ্টা শুধু যে নিরর্থক তা নয়, তাতে শিক্ষাসংস্কারের বদলে শিক্ষার হানি হয়। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর যে সব গলদ রয়েছে সেগুলি দূর করবার চেষ্টা যদি নিরন্তর না করা হয়, তবে তাতেও শিক্ষার অপকর্ষ হতে বাধ্য। মানুষের তৈরী সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানই অসম্পূর্ণ। তাদের স্বভাবে যে-সব ত্রুটি, কালক্রমে সেগুলি আরও বড় হয়ে দেখা দেয়। তার একটি প্রধান

কারণ এই যে ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতায় সম্ভব নয়। তা ছাড়া আজকের অবস্থায় যা উপযোগী, কালকের পরিস্থিতিতে তা বাহুল্য বা ক্ষতিকর হতে পারে। সময়ের প্রবাহের ফলে তাই মানুষের সমাজের সর্বাঙ্গীণ সংস্কার প্রয়োজন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। যে শিক্ষাপ্রণালীর বিষয়ই বিচার করি, তার যতই গুণ থাক, কালক্রমে তার সংস্কার ও পরিবর্তন অনিবার্য্য হয়ে পড়ে।

পরিবর্তন ও সংস্কার মানবসমাজের স্বধর্মে। তাই বলে কিন্তু শাশ্বত বিপ্লবকে স্বীকার করা চলে না। সমস্ত পরিবর্তনই স্বভাবত ক্রমশীল যদি কোন কারণে সেই নিরন্তর পরিবর্তনের স্রোতে বাধা পড়ে, তখনই আড়ষ্ট বা নিরুদ্ধ সংস্কারকে কার্যকারী করবার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন হয়। শিশুর স্বাভাবিক পরিণতিতে কৈশোরের শেষে যৌবন আসে, এ রকম ক্রমবিবর্তনে সংঘর্ষ ও আকস্মিক আবির্ভাবের প্রয়োজন নেই। সুস্থ সমাজে সমস্ত পরিবর্তন তেমনি সহজ ও ধারাবাহিক, তার ব্যতিক্রম হলে বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পড়ে কিন্তু সে ব্যতিক্রম স্বভাববিরুদ্ধ হলে তাতে অকল্যাণের সম্ভাবনা অনেক বেশী। সমাজের বিকাশের পদ্ধতি হিসাবে বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যে বিবর্তনই বাঞ্ছনীয় কেন সে বিচার অন্যত্র করিতে চেষ্টা করেছি। সে সম্বন্ধে যদি পাঠকের আগ্রহ থাকে, তবে আমার সম্প্রতি প্রকাশিত *SCIENCE, DEMOCRACY AND ISLAM* গ্রন্থের Freedom, Authority and Imagination প্রবন্ধে তার খানিকটা পরিচয় পাবেন।

সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়তো বিপ্লব ও বিবর্তনের আপেক্ষিক গুণাগুণ নিয়ে তর্ক করা চলে শিক্ষার ক্ষেত্রে সে রকম তুলনা

একেবারে অচল। ইচ্ছা থাকলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লবসাধন অসম্ভব। সমস্ত শিক্ষার বাহন শিক্ষক এবং শিক্ষক সকল ক্ষেত্রেই প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছেন। তাই ইচ্ছা অনিচ্ছায় শিক্ষক প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীকে কখনোই আমূল অস্বীকার করতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার ফলে ভবিষ্যৎ পুরুষের মনোবৃত্তি, চরিত্র ও ভাগ্য নির্ণয় হয়। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর দোষত্রুটি যতই থাক না কেন, তারই মাধ্যমে সমাজ বর্তমান স্তরে পৌঁছেছে। তার কোন বিপ্লবকারী পরিবর্তন ঘটলে ভবিষ্যৎ পুরুষের উপর তার কি প্রতিক্রিয়া হবে সে কথা বলা কঠিন। ভবিষ্যৎ পুরুষের ভাগ্য নিয়ে খেলার অধিকার কোন শিক্ষা-সংস্কারের আছে কিনা সে কথাও বিচারসাপেক্ষ। তাই সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিপ্লব ও আমূল পরিবর্তন হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে অনিবার্য, এমনকি তাকে বাঞ্ছনীয় মনে করাও হয়তো চলে, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের বিপ্লব সম্ভব কিনা, অথবা সম্ভব হলেও কতদূর বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে গভীর বিবেচনা প্রয়োজন।

ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী তাই রাতারাতি বদলাবে না। ছোটখাট অদলবদল প্রতিনিয়ত চলবে, চলা প্রয়োজন। যাঁরা মনে করেন যে বিশেষ কোন পদ্ধতির প্রচলনের ফলে আমাদের শিক্ষাসমস্যার চিরকালের মতন সমাধান হবে, তাঁরা শিক্ষার মর্মকথাই বোঝেন নি। মানুষের মনের বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য। অভিজ্ঞতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশের ধারা বদলায়। পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার স্বরূপও বদলায়। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে তাই শিক্ষার ধারা,

আদর্শ ও প্রকৃতি বদলায় এবং বদলাতে বাধ্য। স্থাবর মন স্থবির না হয়ে পারে না, এবং স্থাবর শিক্ষার ধারা মনকে স্থবির করতে বাধ্য।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-ধারার সংস্কার ও পরিবর্তন তাই প্রত্যেক শিক্ষকের দৈনন্দিন কর্তব্য। দৈনন্দিন বলে সে পরিবর্তন আমূল নয়, কিন্তু প্রতিদিনের ছোট ছোট সংস্কারের ফলে কালক্রমে শিক্ষা-প্রণালী নবরূপ ধারণ করে। শিক্ষার যে সব গলদ সহজেই ধরা পড়ে, সেগুলি দূর করবার চেষ্টাতে ত্রুটি হলে সমস্ত শিক্ষাধারায় শিথিলতা আসে। সে বিষয়ে গাফিলতি বিপজ্জনক, কারণ জানা-শোনা গলদও যদি না শোধরানো হয়, তবে তার ফলে সমস্ত শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে উঠে।

বর্তমান শিক্ষাধারার যে সব গলদ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নেই, উচ্চশিক্ষার নিম্নমান এবং মাধ্যমিক শিক্ষার একমুখীনতা তাদের অন্যতম। আজ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর ধরে এ দু বিষয়েই আলোচনা হয়ে আসছে। সবাই একমত, যে কৈশোরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে শুরু করে। শিশুদের রুচি ও মনোভাবেও বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শৈশবের শিক্ষার ধারা সকলের জন্য অনুরূপ হলে ক্ষতি নেই। শৈশবে শিশু পৃথিবী সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন ও শারীরিক ও মানসিক অভ্যাসগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাই প্রাথমিক শিক্ষায় বৈচিত্র্যের প্রয়োজন তত বেশী নয়। শৈশবের শেষে কৈশোরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর পৃথিবীকে নিজের মনের রঙে রাঙিয়ে দেখতে শুরু করে তাই মাধ্যমিক শিক্ষায় বিভিন্ন বালকবালিকার বিচিত্র রুচি ও শক্তিকে স্বীকার না করলে

শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। আমাদের দেশে এখনো এ কথা পুরোপুরি স্বীকার করা হয় নি বলে বহু বালকবালিকার জন্য শিক্ষা নিরর্থক হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন শক্তি ও রুচি অনুসারে কারু ঝোঁক হাতের কাজে, কারুবা আনন্দ শিল্পকৌশলে, কেউবা বুদ্ধি ও জ্ঞানের সন্ধানে চিত্তের তৃপ্তি পায়, কিন্তু সবাইকে যদি একই পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষাধারার কয়েদী বানিয়া দেওয়া হয়, তবে তাদের অনেকের মনেই প্রচলিত শিক্ষাধারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠবে। বস্তুতপক্ষে হয়েছেও তাই। আজ যে দেশে শিক্ষাধারার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ, লক্ষ লক্ষ অতৃপ্ত ও অসার্থক কিশোর ও যুবকের ব্যর্থতাবোধ থেকেই তার জন্ম।

মাধ্যমিক শিক্ষাকে তাই আজ বহুমুখীন ও বৈচিত্র্যময় করতে হবে। পুরাকালে হয়তো এ বহুমুখীন শিক্ষা না হলেও চলত, কারণ তখনকার দিনে যে মুষ্টিমেয় বালকবালিকা প্রাথমিক শিক্ষার দ্বার অতিক্রম করে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে পৌছত, বিশেষ আগ্রহ বা বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন তারা এ কষ্ট সাধন করত না। সমাজে শতকরা নিরানব্বই জন সেকালে কৈশোরে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী জীবনের বিশেষ বৃত্তি বা কর্মের শিক্ষানবিশি করত বলে বাকী শতকরা একজন পুঁথিসর্বস্ব বিদ্যা আয়ত্তে মন দিলে তাতে সামাজিক বা বক্তিগত কোন সমস্যা-সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না। গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। গণতন্ত্রের মূলকথা সকলের সমান অধিকার। শিক্ষার সমান সুযোগ না পেলে সমান অধিকারের কথা পরিহাস হয়ে দাঁড়ায়। তাই গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পরিবর্তে সমগ্র সমাজের আয়ত্তে আনবার চেষ্টা

হয়েছে। সামগ্রিক শিক্ষার পরিকল্পনা যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম দেখা দিয়েছিল তা আকস্মিক বা অকারণ নয়। বিলাতেও গণতন্ত্র প্রসারের সঙ্গে সার্বিক শিক্ষার পরিকল্পনা প্রসারিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার সর্বব্যাপী ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথম লক্ষ্য ও লক্ষণ। কালক্রমে আজ মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বজনীন ব্যবস্থার দাবীও দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে এখনো আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বিক করতে পারিনি, তাই মাধ্যমিক শিক্ষাকে সার্বিক করার প্রশ্ন এখনো ওঠে না, কিন্তু যুগধর্মের প্রভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার যে বিপুল প্রসার ঘটেছে, তাকেও অস্বীকার করা চলে না। গত সাত-আট বৎরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশী বেড়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে সমস্ত ভারতবর্ষে এ ধরনের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ত্রিশ লক্ষেরও কম ছিল, ১৯৫৫ সালে সে সংখ্যা ষাট লক্ষের বেশী, এবং বর্তমানে বোধ হয় সত্তর লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

এই বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে আজকাল মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এসেছে, তাদের রুচি, শক্তি ও স্পৃহার স্বভাবতই বহু পার্থক্য। তাই পুরাতন একমুখী গ্রন্থকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারা আজকার ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেটাতে একান্তভাবে অপরাগ। বর্তমানের পৃথিবীতে সমাজ-জীবন দিন দিন জটিল হয়ে উঠছে, পুরনো দিনের পরিচিত বৃত্তিগুলিও নূতন পরিস্থিতে নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে। কৃষিকাজ মানুষের আদিমতম বৃত্তি, কিন্তু বর্তমান যুগের যান্ত্রিক সভ্যতার দাবি এই চিরপুরাতন বৃত্তিকেও আমূল বদলে দিয়েছে। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনুরূপ পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন দেশের

পারস্পরিক সম্বন্ধ দিন দিন ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠছে বলে আজ এক দেশের লোক অন্য দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে পরিচয় আজ প্রত্যেক নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় বলে শিক্ষা সুস্থ সমাজ জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের পারস্পরিক সম্বন্ধ দিন দিন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে, অন্যদিকে গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে প্রত্যেক নরনারীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব বেড়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান পৃথিবীতে ব্যক্তিসমৃদ্ধি ও জাতীয় সমৃদ্ধি দুই-ই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তার ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত। তাই যে দেশে শিক্ষা ও জ্ঞান যত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, সে দেশের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি তত বেশী। এই সব কারণে আজ যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রসার প্রাথমিক ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে মাধ্যমিক স্তরেও ছড়িয়ে পড়বে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আজ দাবি উঠেছে যে কলেজী শিক্ষাকেও সর্বজনসুলভ করে তুলতে হবে।

শিক্ষার এই বিপুল প্রসারের ফলে পুরোনো পুঁথিসর্বস্ব বা বুদ্ধিকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারা আজ সমাজের সমস্ত দাবি মেটাতে পারে না। এ কথার অর্থ এ নয় যে বুদ্ধিকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল্য কমে গিয়েছে, বা কমতে পারে। বুদ্ধির বিকাশের ফলে মানুষ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, তাই মানব-জীবনে বুদ্ধির প্রাধান্য চিরদিনই থাকবে, এবং যে শিক্ষার ফলে বুদ্ধির উৎকর্ষ ও জ্ঞানের প্রসার বাড়বে, সমস্ত শিক্ষার মধ্যে তার স্থান অবিসম্বাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। বুদ্ধির এ মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নিয়েও মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখীন ধারার প্রবর্তন আজ প্রয়োজন, কারণ তা না করলে

সমাজের একটা মহৎ অংশ শিক্ষার সার্থকতা খুঁজে পাবে না। গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাই নানা ধরনের নূতন শিক্ষাপ্রণালী ও প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব অনিবার্য। বিভিন্ন রুচি, শক্তি ও স্বভাবের বিভিন্ন কিশোরকিশোরীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ তা নইলে সম্ভব হবে না। প্রথম দৃষ্টিতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ ও সংগঠন সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এমন কি পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হয়, কিন্তু দুই দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শ ও ব্যবস্থা দিন দিন পরস্পরের অনুরূপ হইয়া উঠছে।

ভারতবর্ষে শিক্ষা সংস্কারের সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে তাই মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত ও সংখ্যাগত সম্প্রসারণকে প্রথম স্থান দেওয়া চলে। বর্তমানে শতকরা দশজন কিশোরকিশোরীরও মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ মেলে না, গণতন্ত্রকে কার্যকরী ও সার্থক করতে হলে আগামী দশবৎসরের মধ্যে তাদের সংখ্যা অন্তত দ্বিগুণ হওয়া প্রয়োজন। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দুই কোটি দাঁড়াবে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই যে কেবল পুঁথিগত বা বুদ্ধিকেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিতৃপ্তি পাবে না, এ কথা বলা বাহুল্য। বর্তমানে তাই মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করবার নানা চেষ্টা চলেছে। তার মধ্যে বহুমুখীন স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। একই স্কুলের আওতায় সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, কারুশিল্প, কৃষি প্রভৃতি শেখাবার ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন শক্তি ও রুচির কিশোরকিশোরী নিজ নিজ অভিপ্রায় ও অভিরুচি অনুসারে শিক্ষালাভ করতে পারবে। একই স্কুলে একসঙ্গে অধ্যয়নের ফলে কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষাকে হেয় জ্ঞান করবার কোন অবকাশ থাকবে না। শুধু তাই নয়। কিশোর

বয়সের রুচির পার্থক্য প্রথম ধরা দিতে শুরু করে এ কথা সত্য, কিন্তু প্রথম যে দিকে ঝোঁক দেখা দেয়, সেই ঝোঁকই যে সারা জীবন কার্যকরী থাকবে তারও কোন ভরসা নেই। প্রথম জীবনে তাই বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি ও শিক্ষালাভের সুযোগ কিশোর-কিশোরীর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন। বহুমুখীন বিদ্যালয়ে নানা ধরনের বৃত্তি ও শিক্ষার একত্র সমাবেশে সহজেই ছাত্রছাত্রী সে সুযোগ পায়। তা নইলে বিষয় বদলের সঙ্গে সঙ্গে যদি শিক্ষার্থীকে এক বিদ্যালয় ছেড়ে অন্য বিদ্যালয়ে যেতে হয়, তবে তাতে তার শিক্ষা ও মানসিক বিকাশে ছেদ পড়বার আশঙ্কা থাকে।

সাম্প্রতিক শিক্ষা পরিকল্পনায় তাই ভারতবর্ষের দশ হাজার হাইস্কুল বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মধ্যে অন্ততঃ আড়াই হাজারকে বহুমুখীন বিদ্যালয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ১৯৫৬ সালের মধ্যেই প্রায় পাঁচশো স্কুলের এ-রূপান্তর সম্পূর্ণ হবার কথা ছিল। ১৯৫৬-৬১ সালের মধ্যে আরো দু হাজার স্কুলের উন্নয়ন করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু অর্থ ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে হাজারের বেশি স্কুলের রূপান্তর সাধন হয়তো সম্ভব হবে না। শিক্ষার প্রয়োজন ভিন্নও এ-রূপান্তরের সার্থকতা রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরেই যদি নানা ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তবে বর্তমানে উপযুক্ত অনুপযুক্ত সকল শিক্ষার্থীই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ধর্ণা দেয়, তাতে হয়তো খানিকটা মন্দা পড়বে। উচ্চ শিক্ষার নিজস্ব সার্থকতা আছে একথা সত্য, কিন্তু বর্তমানে যারা উচ্চ শিক্ষার স্তরে ভিড় করে, তাদের সকলেই যে কেবল শিক্ষার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এ কথা মনে করা ভুল। বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে বহু শিক্ষার্থী কেবল অন্য কোন পথ খুঁজে পায় না বলে শিক্ষার্থী জীবনের মেয়াদ বাড়িয়ে

চলে। তাতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না, বরং সমাধানের দিন পেছিয়ে যায় বলে সমস্যা দিন দিন জটিলতর হয়ে ওঠে। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রারম্ভে বা শেষে যে ধরনের সমাধান হয়তো কিশোর বা যুবক আনন্দে মেনে নিত, উচ্চশিক্ষালাভের পরে প্রাপ্ত যৌবনে সে সমাধন তার কাছে বিষময় মনে হয়।

৯

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার সংস্কার না হলে মাধ্যমিক শিক্ষার এ রূপান্তর পুরোপুরি ফল দেবে না। উচ্চ শিক্ষার যে সমস্ত সংশোধন প্রয়োজন, শিক্ষার মান উন্নয়নকে তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিলে অন্যায় হবে না। আমাদের দেশে নানা কারণে উচ্চ শিক্ষাকে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা বলা চলে না। কেউ কেউ বলেন যে সংখ্যাধিক্যের জন্য উচ্চ শিক্ষার এ অবনতি ঘটেছে। যেখানে আট-দশ বৎসর আগেও সারা ভারতবর্ষে বৎসরে মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ হাজার বিদ্যার্থীর ডিগ্রী মিলত, এখন সেখানে পঞ্চশ হাজারের বেশী ডিগ্রীধারী প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়ে বেরিয়ে আসে। এবং ডিগ্রীপ্রার্থী ও ডিগ্রীধারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। স্বাধীনতার পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ষের চেয়ে বর্তমানের বিভক্ত ভারতে ইউনিভার্সিটির সংখ্যা অনেক বেশী, এবং দিন দিন নতুন ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং ছাত্রসংখ্যা যে বেড়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু কেবলমাত্র সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য উচ্চ শিক্ষার অবনতি ঘটেছে এ কথা সত্য নয়। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা, শিক্ষার ঐতিহ্য এবং আগ্রহ ও সর্বোপরি স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রয়োজনের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং

ছাত্রসংখ্যা কোনটিকেই অত্যধিক বলা চলে না। যে দেশে প্রায় আটত্রিশ কোটি লোকের বাস, সে দেশে সাত-আট লক্ষ উচ্চ শিক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যা মোটেই বেশী নয়।

গলদ তাই সংখ্যায় নয়, গলদ যে সব ছাত্রছাত্রী কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে তাদের নির্বাচন এবং উচ্চ শিক্ষার সংগঠনে। যোগ্যতা বা আগ্রহের বিচারে শিক্ষার্থীরা কলেজে ভর্তি হয় না, বহু মেধাবী এবং জ্ঞানান্বেষী ছাত্র অর্থাভাবে লেখাপড়া ছেড়ে দেয় এবং বহু অনিচ্ছুক এবং অক্ষম যুবক-যুবতী পারিবারিক স্বচ্ছলতার ফলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় জমায়। পূর্বেই বলেছি যে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে শক্তি ও রুচি অনুযায়ী মেধাবী ছাত্রছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত দ্বিবার্ষিক ডিগ্রীর বদলে তেসালা ডিগ্রীর প্রচলন করা প্রয়োজন। বর্তমানে ম্যাট্রিকের পরে দু বৎসর ইণ্টার এবং দু বৎসর বি. এ. ডিগ্রীর রেওয়াজ যে সব ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে, সে সব বিশ্ববিদ্যালয়েও উন্নততর মাধ্যমিক শিক্ষার পরে তিন সালা ডিগ্রীর প্রচলন করলে বর্তমানের কলেজী শিক্ষার একটি প্রধান গলদ দূর হবে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গড্ডলিকা প্রবাহের স্থান নেই। বিশেষ শক্তি বা আগ্রহ না থাকলে উচ্চ শিক্ষায় লাভও হয় না। তাই একপক্ষে মাধ্যমিক স্তরে নানান বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং অন্যপক্ষে নানা ধরনের সরকারী কাজে উচ্চ শিক্ষার আবশ্যিক দাবি স্থগিত করবার চেষ্টা চলেছে। আজকাল যারা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আসে, তাদের মধ্যে একটি বিপুল অংশ কেবল সময় কাটাবার জন্য আসে। শুধু তাই নয়, সরকারী কাজের জন্য নিজেদের যোগ্যতা বাড়বার তাগিদও তাদের মনে অন্তত সমান সক্রিয়। বর্তমানে

অধিকাংশ সরকারী কাজের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী চাই, বেসরকারী কাজের জন্যও ডিগ্রীধারীর চাহিদা বেশী, তাই শিক্ষার্থীর দল ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কলেজে ইউনিভার্সিটিতে ভিড় করে। তাদের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা নেহাত বেগার ঠেলা তাই কলেজে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তারা নিজেরা তো ফল পায়ই না, বরং তাদের গড়িমসির ফলে উচ্চ শিক্ষার স্তর নেমে যায়। যারা সত্যিকার বিদ্যার্থী, তারও অধিকাংশ অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীর দঙ্গলে পড়ে পরিপূর্ণভাবে লাভবান হয় না। তাই বর্তমানে সরকারী কাজের জন্য ডিগ্রীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ বিচার চলেছে। ভারত সরকারের যে কমিটি এ বিষয়ে তদন্ত করছে তাদের রিপোর্ট সম্প্রতি বেরিয়েছে। কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করেছে যে সরকারী চাকুরীর প্রায় শতকরা নব্বইটির জন্য ডিগ্রীর বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। কমিটির কয়েকজন সদস্যের মতে বাকী শতকরা দশটি উচ্চতর কাজের বেলায়ও ডিগ্রীর উপর জোর দেওয়ারও কোন সার্থকতা নেই। গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায়নি কিন্তু আশা করা যায় যে কি ধরণের কাজে ডিগ্রীর প্রয়োজন এবং কি ধরনের কাজে তার দরকার নেই পরিষ্কারভাবে তা জানা গেলে শুধু চাকুরির লোভে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করে, তাদের সংখ্যা অনেকখানি কমবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরোন্নতি করাও বিশেষ প্রয়োজন। চাকুরির মোহে এবং অন্য কিছু করবার নেই বলে বহু শিক্ষার্থী আজ কলেজের খাতায় নাম লেখায়। মাধ্যমিক শিক্ষার অসম্পূর্ণতাও তার অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে যে মানসিক পরিণতি, পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থী তা

আয়ত্ত করে। বস্তুতপক্ষে অন্যান্য দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার যে মান আমাদের দেশে তা লাভ করতে হলে কলেজের পাঠ শেষ করতে হয়। বিলাতের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার বিষয় এবং মান বিচার করে দেখেছি যে বহু ক্ষেত্রে তা এদেশে বি. এ. পরীক্ষার সামিল। তাতে আশ্চর্য হবারও বিশেষ কোন কারণ নেই। ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই সতেরো বা আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ। আমেরিকায় বা রুশ দেশেও তাই। বিলেতে আঠারো বৎসর বয়সের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় না, অক্সফোর্ডে বা কেম্ব্রিজে ভর্তির বয়স উনিশ। অথচ আমাদের দেশে বহু শিক্ষার্থী পনেরো-ষোলো বৎসর বয়সে স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে আঠারো-উনিশে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরী হয়। পনেরো বৎসরের ভারতীয় শিক্ষার্থীর যে আঠারো বা উনিশ বৎসরের ইউরোপীয় বা আমেরিকান শিক্ষার্থীর তুলনায় কম জানবে বা বুঝবে, তাতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। কেবল জানা বা বোঝার কথা নয়। পনেরো-ষোলো বৎসরে শারীরিক ও মানসিক পরিণতির বাল্যাবস্থা—সতেরো-আঠারো বৎসর বয়সের আগে নবযৌবনের শারীরিক ও মানসিক পরিণতি সম্ভব নয়। তাই সতেরো-আঠারো বৎসরের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও শিক্ষার্থী দেহে মনে বালকবালিকা ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না।

তাই আজকাল যে শিক্ষা-সংস্কারের পরিকল্পনা, মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ বাড়ানো তার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। আমাদের দেশ গরিব, এদেশে জীবনের প্রত্যাশা ইউরোপ বা আমেরিকার চেয়ে কম, তাই ·পাশ্চাত্য দেশের মতন এদেশেও মাধ্যমিক শিক্ষার

মেয়াদ আঠারো বৎসর করা সহজ নয়, কিন্তু অন্ততপক্ষে যদি সতেরো বৎসর কড়ার দেওয়া হয়, তবে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যাপ্ত উন্নতি হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সতেরো বৎসর পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদের অর্থ যে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর ছাত্র-জীবন দু বৎসর বেশী বেড়ে যাবে এবং সেই দু বৎসরের সদ্ব্যবহার করতে পারলে তারা স্বাধীন ভারতের যোগ্যতর নাগরিক বলে গণ্য হতে পারবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সংস্কারের এ সমস্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যায় এ সংস্কারের ফলে দেশে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও সুবিধা কমে যাবে। এ আপত্তি একেবারে ভিত্তিহীন হলেও বার বার উল্লেখের ফলে জনসাধারণের মনে খানিকটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, এবং সে সন্দেহ নিরসন না হলে কোন সংস্কারই পুরোপুরি কার্যকরী হবে না। যাঁরা এ আপত্তি তোলেন, তাঁদের প্রধান যুক্তি দুটি। তাঁরা বলেন যে, ভারত সরকার যে বর্তমানে সরকারী কাজের জন্য ডিগ্রীর প্রয়োজনীয়তা রদ করার কথা তুলেছে, তার ফলেই উচ্চ শিক্ষার প্রতি লোকের ঝোঁক কমে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক করে তার মেয়াদ বাড়ানো যায় এবং ডিগ্রীর পাঠ্য বৎসর দুয়ের জায়গায় তিন বৎসর করা হয়, তবে তাঁদের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষী ছাত্রের সংখ্যা কমতে বাধ্য।

একটু বিবেচনা করলেই দেখা যাবে যে আপত্তি দুইটি অযৌক্তিক এবং পরস্পরবিরোধী। কেবলমাত্র চাকুরির জন্য ডিগ্রী প্রয়োজন বলে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করে, তাদের প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শিক্ষার্থী বলা চলে না। তারা যে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ এবং শিক্ষার মান নামিয়ে দেয় তার উল্লেখ আগেই করেছি। যারা

কেবলমাত্র সরকারী চাকরির উমেদার, তাদের সংখ্যা যদি খানিকটা কমেও, তবে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না। যারা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে, তারা শিক্ষার প্রেরণায় আসবে বলে শিক্ষার মান উন্নত করা সহজ হবে। শুধু তাই নয়। যে ভাবে দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা কম হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। পূর্বেই বলেছি যে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ থেকে বেড়ে সত্তর লক্ষ পার হয়ে গিয়েছে এবং আগামী দশ-বারো বৎসরে সে সংখ্যা দু কোটির কাছাকাছি পৌছবে। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যাও গত আট-নয় বৎসরে প্রায় ত্রিগুণের চেয়ে বেশী বেড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের ফল তবু এখনো পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌছেনি। ১৯৪৭ সালে প্রাথমিক স্তরে দেড় কোটির কম ছাত্রছাত্রী ছিল, ১৯৫৫ সালে প্রায় আড়াই কোটির কাছাকাছি পৌচেছে এবং দেশে যখন পরিপূর্ণ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন হবে, তখন প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পাঁচ কোটিতে দাঁড়াবে। প্রাথমিক শিক্ষার এ সম্প্রসারণের পরিপূর্ণ ফল যেদিন মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌছবে, তখন ছাত্র-সংখ্যা সঙ্কোচনের প্রশ্ন তো উঠতেই পারবে না, বরং তখন সমস্যা হবে যে কিভাবে এ সংখ্যাকে পরিমিত রাখা যায়। বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিশেষ করে বাংলা দেশে বহু কলেজ-কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছেন যে বর্তমানের চার-সালা কলেজী শিক্ষার বদলে তে-সালা ডিগ্রীর প্রচলন হলে কলেজে ছাত্রসংখ্যা কমে যাবে এবং কোন কোন স্থানে কলেজ বন্ধ করতে হবে। তাঁরা একথা ভুলে যান যে শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে অনুপযোগী বা

হীনমান দু-চারটি কলেজের বিলোপ কারু কারু ব্যক্তিস্বার্থের হানিকর হতে পারে কিন্তু দেশের জন্য কল্যাণদায়ক। আসলে কিন্তু সে প্রশ্ন উঠবেই না, কারণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের ফলে আগামী আট-দশ বৎসরের মধ্যে তে-সালা ডিগ্রী কলেজের ছাত্র-সংখ্যা বর্তমানের চার-সালা কলেজের ছাত্র-সংখ্যার চেয়ে বেশী হতে বাধ্য, অন্ততপক্ষে কম যে হবে না সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় পাঁচ-ছয় লক্ষ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে। ম্যাট্রিক বা অনুরূপ পরীক্ষা পাশ করে তাদের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ সাড়ে তিন লক্ষ, কিন্তু কলেজে ভর্তি হয় মোটে দেড় লক্ষ। অর্থাৎ যারা মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছয়, তাদের অর্ধেক কলেজে ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্জন করে এবং যারা এ ভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে, তাদের মোটে অর্ধেক কলেজের খাতায় নাম লেখায়। পূর্বেই বলেছি যে পনেরো-ষোলো বৎসরেই অধিকাংশ শিক্ষার্থী ম্যাট্রিক বা অনুরূপ পরীক্ষা দেয়। তেরো-চোদ্দ বৎসরের পরীক্ষার্থীরও অভাব নেই। মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ সতেরো বৎসর পর্যন্ত বাড়ালে যে প্রায় চার লক্ষ ছেলেমেয়ে বর্তমানে পনেরো-ষোল বৎসর বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, তারা অন্ততঃ দু এক বৎসর বেশী লেখাপড়া করবে। তার ফলে সত্যিকার লেখাপড়ার স্তর উন্নত হবে এবং বর্তমানের চেয়ে প্রায় দু গুণ তিনগুণ ছেলেমেয়ে উচ্চতর শিক্ষার আস্বাদ পাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে ছাত্র-সংখ্যা যখন দু কোটির কাছে পৌঁছবে, তখন যে এ লাভ আরো ব্যাপকভাবে, সমাজে ছড়িয়ে পড়বে সে-কথা বলাই বাহুল্য।

শুধু তাই নয়। বহুমুখীন বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ রুচি, শক্তি ও অভিলাষ অনুসারে শিক্ষালাভ করবে বলে শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়তে বাধ্য। বর্তমানে সমস্ত ছেলেমেয়েকে একই ঘানিতে জুড়ে দেওয়া হয় বলে যাদের এ ধরনের শিক্ষায় রুচি নেই, তারা সমস্ত শিক্ষার প্রতিই বীতরাগ হয়ে পড়ে। বর্তমানে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার অবনত মানের এও একটি কারণ। শিক্ষা সংস্কারের ফলে এ অবস্থার প্রতিকার হলে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে নিজ নিজ রুচি অনুসারে শিক্ষালাভের আগ্রহও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাড়বে। যথেষ্ট সংখ্যক বৃত্তি, জলপানি, এনাম, স্কলারশিপ বা স্টাইপেণ্ড-এর ব্যবস্থা করতে পারলে উচ্চ শিক্ষার ছাত্র সংখ্যা তো কমবেই না, বরং যারা উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত গুণগ্রাহী, তারাই সে শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হবে। বর্তমানে এ বিষয়ে বিবেচনা চলেছে এবং আগামী বৎসর থেকে ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার মেধাবী দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা বাড়াবেন এ আশা করা অন্যায় হবে না।

১০

বর্ত্তমানের পুঁথিসর্বস্ব একপেশে স্কুলের বদলে উপযুক্ত সংখ্যায় বহুমুখী স্কুল স্থাপন করে পাঠক্রমকে বহুমুখী ও বিচিত্র করলে দুদিক থেকে লাভ হবে। এক তো বিভিন্ন ছাত্রের রুচি ও আগ্রহের খোরাক মিলবে বলে ক্লাসে পঠনপাঠনের একঘেয়েমি কমে যাবে এবং তার ফলে ছাত্রছাত্রী শিক্ষাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের শৃঙ্খলা এবং অনুশাসনের

উন্নতি হবে। ক্লাসের লেখাপড়ায় আনন্দ পায় না, অথবা বহু জিনিস ছেলেমেয়েদের গ্রহণশক্তিতে কুলোয় না বলেই তারা অমনোযোগী হয়ে থাকে, এবং অমনোযোগ থেকে অনুশাসন-হীনতায় পৌছুতে বিশেষ দেরি হয় না। বহুমুখীন পাঠক্রম এবং ক্লাসের ভেতরে বাইরে নানা ধরনের আনুষঙ্গিক কার্যধারার প্রবর্ত্তন তাই শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারের অপরিহার্য অঙ্গ বললে অত্যুক্তি হবে না।

বর্ত্তমানের পরীক্ষা-প্রণালীর সংস্কার না করলে কিন্তু পাঠক্রমের সম্প্রসারণ অথবা আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের প্রবর্ত্তন সম্ভব হবে না। আমাদের দেশে পরীক্ষার উপর যে ভাবে ঝোঁক দেওয়া হয়, পৃথিবীর আর কোথাও বোধ হয় তার নজির মেলে না। সারাবৎসর ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করুক বা না করুক, তাদের শারীরিক মানসিক বিকাশ হোক বা না হোক, তাতে যেন কিছুই আসে যায় না, বৎসর বা দ্বিবৎসর অন্তর যে পরীক্ষা তাতে কোনরকমে পাশ করতে পারলেই আমরা শিক্ষাকে সফল মনে করি। শুধু ছাত্রদের নয়, শিক্ষক অথবা স্কুলকলেজের সার্থকতাও আমরা পরীক্ষার সাফল্য দিয়ে বিচার করতে চাই। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল যে, জনৈক শিক্ষাধুরন্ধর প্রস্তাব করেছেন যে যদি কোন স্কুলের ছাত্রছাত্রী যথেষ্ট সংখ্যায় পাশ না করে, তবে হেডমাস্টার এবং অন্যান্য শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি এবং পদোন্নতি বন্ধ রাখতে হবে।

ভাল করে সারাবছর পড়াশোনা করলে ছাত্রছাত্রীদের ফেল করার কোন কারণ নেই, বরং কখনো কখনো এ কথাও আমার মনে হয়েছে যে বর্তমানে আমাদের শিক্ষার দাবি এত কম, পরীক্ষার স্তর এত নেমে গিয়েছে যে বিশেষ সাধনা না করলে বোধ হয় ফেল

করা সত্যি কঠিন। সে দিক থেকে কোন স্কুল-কলেজের বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ফেল করলে সত্যই সেটা একটা বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে, কিন্তু কেববমাত্র ছাত্রছাত্রীদের ফেল-পাশের অনুপাত দিয়ে শিক্ষক বা স্কুলের বিচার করবার চেষ্টা কেবল ভুল নয়, বরং তাতে শিক্ষার ক্ষতি হতে বাধ্য। এ ধরনের কোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করলে বর্ত্তমানের গলদ ও বদ অভ্যাসগুলি আরো বদ্ধমূল হবে মাত্র, কিন্তু শিক্ষার কোন উন্নতি হবে না।

শিক্ষার প্রচলিত অভ্যাস নিয়ে যদি বিচার করা চলে—তাকে ব্যবস্থা বলব না, কারণ শিক্ষাসংগঠনে এ রকম ব্যবস্থার কোন অভ্যাস নেই, কেবলমাত্র আমাদের গাফলতির ফলে এ অভ্যাস গড়ে উঠেছে, তবে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভাবিয়ে তুলেছে যে অভ্যাস, সেটি হল সারা বৎসর লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা করে পরীক্ষার প্রাক্কালে দিন নেই রাত নেই পুঁথি মুখস্থ করবার প্রবৃত্তি। সারা বৎসরের কাজের প্রতি কোন মনোযোগ দেওয়া হয় না, তার বিশেষ কোন ওজন বা মূল্য নেই বলে শিক্ষার্থীরা বহুক্ষেত্রে সংবৎসর লেখাপড়ার কথা ভাবেই না। কৈশোর এবং যৌবনের অফুরন্ত উদ্যম লেখাপড়ায় ব্যবহার হয় না বলে তা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এই উদ্যম উৎসাহের অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশের অর্থই বিশৃঙ্খলা, অনুশাসনহীনতা এবং অবশেষে উচ্ছৃঙ্খলতা।

একজন অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী শিক্ষক দুঃখ করে বলেছিলেন যে আমাদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিগুলিও বর্তমানে বিকৃত হয়ে সমস্যা ও ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই তার নমুনা মেলে। সঙ্গীত ও চারুকলা মানুষের জীবনকে সুন্দর ও রমণীয় করে তোলে, কিন্তু বর্তমানে বহুক্ষেত্রে সঙ্গীতের নামে

লাউডস্পীকার লাগিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা যে কোলাহলের সৃষ্টি হয়, তাতে সঙ্গীতলক্ষ্মীর মর্যাদা বাড়ুক আর কম হোক, পাড়ার লোকে যে দু তিন রাত ঘুমোতে পারে না সে কথা ভুক্তভোগী সকলেই স্বীকার করবেন। তেমনিভাবে নানা ধরনের সার্বজনীন উৎসব—তা সে কোন ধর্ম অনুষ্ঠান অথবা সামাজিক উপলক্ষ, যা নিয়েই হোক না কেন—যখন প্রথম প্রচলিত হয়, তখন সকলের মধ্যে হৃদয়ের যোগেই তার প্রধান সার্থকতা ছিল। বর্তমানে হৃদয়ের যোগ তো কর্পূরের মত উবে গিয়েছে, বহুক্ষেত্রে এ ধরনের সার্বজনীন অনুষ্ঠান সাধারণ গৃহস্থের কাছে এক বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাঁদার অত্যাচার তো আছেই, তা ছাড়া সার্বজনীন উৎসবের নাম করে বালক শিশু কিশোর পারিবারিক শাসনকে অস্বীকার, এবং কখনো কখনো লঙ্ঘন করতে শেখে। উৎসবের দু তিন দিন আগে থেকে শুরু করে উৎসব শেষ হবার দু তিন দিন পর পর্যন্ত জীবনের সহজ গতি ব্যাহত হয়ে রাত্রি এবং দিনগুলি হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায়।

পরীক্ষার ক্ষেত্রেও যে আমাদের দেশে অনুরূপ বিকৃতি ঘটেছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বরং এ ক্ষেত্রে স্বদেশী এবং বিদেশী দু ধরনের সংস্থানেরই বিকৃতি দেখা দিয়েছে। ভারতীয় জীবন এক কালে চার আশ্রমে বিভক্ত ছিল—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। এই চতুরাশ্রমের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে বিকশিত এবং সমাজের সেবা করত। বর্তমানের পরীক্ষাপ্রণালীর ফলে এই চতুরাশ্রমের এক শোচনীয় বিকৃতি ছাত্রজীবনে দেখা দিয়েছে। একমাত্র আখেরী পরীক্ষা দিয়ে ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় বলে শিক্ষার্থী সারা বৎসর অন্যান্য নানা হুজুগে মেতে থাকে। প্রথম

তিন মাস কলেজে লেখাপড়ার বিশেষ কোন বালাই নেই। তখন ইউনিয়ন, সাহিত্যসমিতি, সংস্কৃতিসভা প্রভৃতি নানা ধরনের সংগঠনের নির্বাচনের হট্টগোলে কলেজ ভরপুর। সঙ্গে সঙ্গে দেশোদ্ধারের প্রবল বন্যা ডাকে। পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা সমাধানে যতটা না হোক, দেশবিদেশের নেতাদের কার্যকলাপের সমালোচনায় তরুণ শিক্ষার্থী মশগুল হয়ে থাকে। শিক্ষার্থী জীবনের এ স্তরকে রাজনৈতিক বা নির্বাচনী আশ্রম বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না।

দ্বিতীয় আশ্রম সাধারণত শুরু হয় শারদীয় ছুটির অব্যবহিত আগে বা পরে। তখন নানা ধরনের নাটক সঙ্গীত অনুষ্ঠান, আবৃত্তি বা তর্ক প্রতিযোগিতা, শিল্পপ্রদর্শনীর প্রতি শিক্ষার্থীর ঝোঁক। প্রায় ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এ সাংস্কৃতিক আশ্রমের পরিপূর্ণ প্রকোপ বজায় থাকে। তার পরে যখন বার্ষিক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আসন্ন হয়ে আসে, তখন ডিসেম্বর-জানুয়ারি থেকে দু তিন মাস শুরু হয় মুখস্থ-আশ্রম। সারা বৎসর বা কখনো-কখনো পুরো দু বছরে যে লেখাপড়া করা হয়নি, দু-তিন মাসের মধ্যে তাকে পুরোপুরি আয়ত্ত করা সহজ নয়, বহুক্ষেত্রে সম্ভবও নয়। কাজেই সে শিক্ষাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টার বদলে বাছাই করা কিছু প্রশ্নের উত্তর কণ্ঠস্থ করবার সাধনাই তখন শিক্ষার্থীর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তাদের মানসিক বিকাশ হোক বা না হোক, জ্ঞানভাণ্ডার বাড়ুক বা না বাড়ুক, বহু শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের যে অবনতি হয় তা ভুক্তভোগী সকলেই জানেন।

তিন আশ্রম পার হয়ে চতুর্থ আশ্রম শুরু হয় পরীক্ষার অব্যবহিত পরে। তখন শিক্ষার্থীর অকস্মাৎ গুরুভক্তি ও ধর্মবোধ জেগে উঠে। প্রথম সাধনা হয় বিভিন্ন পরীক্ষকের নাম আবিষ্কার এবং কোন কোন

ক্ষেত্রে তাঁদের কলেজ অথবা বাড়িতে তীর্থযাত্রা। ভক্তি অবশ্য কখনো কখনো উৎকটভাবেও দেখা দেয়। ফলে পরীক্ষকেরা পরীক্ষার ফল ভালোয় ভালোয় না বেরোনো পর্যন্ত শঙ্কিত ও কণ্টকিত জীবন যাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের ধর্মবোধ নানা ধরনের পূজা, শিরনী, মানত অথবা মন্দির-মসজিদ-গির্জা-মাজারে যাতায়াতের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠে। পরীক্ষার ফল না বেরোনো পর্যন্ত এ আধ্যাত্মিক আশ্রম প্রবলভাবে শিক্ষার্থীকে অভিভূত করে রাখে।

পরীক্ষার ধরন ও প্রকৃতি বদলালে শিক্ষার্থীজীবনের এ বিকৃত আশ্রম-ব্যবস্থাও বদলাবে। যদি আখেরী পরীক্ষাকেই একমাত্র লক্ষ্য না করে তার বদলে সারা বৎসরের নিয়মিত কাজের যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হয়, তবে শিক্ষার্থীরাও সারা বৎসর শিক্ষার জন্য মেহনত করতে বাধ্য হবে। তার ফলে যে কেবল অধীত বিদ্যা আয়ত্ত করা সহজ হবে, তা নয়, সারা বৎসরের উদ্বৃত্ত উদ্যম ও উৎসাহ শৃঙ্খলিত হবে বলে সমস্ত জীবনের মধ্যে নতুন শৃঙ্খলা ও সংযম আসবে। বর্তমানের পরীক্ষা ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দিনের পর দিন একটানা ভাবে কাজ করে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবার সুযোগ মেলে না, বরং আকস্মিক উত্তেজনা ও সাময়িক কঠিন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি উৎসাহিত হয়। সংহত জীবন যাপন করতে শেখা শিক্ষার যে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, বর্তমান অবস্থায় তা অপূর্ণ থেকে যায়। সারা বৎসরের দৈনন্দিন কাজের হিসাব, মাসিক বা দ্বৈমাসিক বিচারের ফলাফল এবং আখেরী পরীক্ষার নির্ণয়—এই তিনটি জিনিসের উপরেই যদি সমান ঝোঁক দেওয়া হয়, তবে বর্তমান পরীক্ষার অব্যবস্থা তো দূর হবেই, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার প্রধান একটি কারণ মিটে যাবে।

পরীক্ষার ধারা বদলের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে পঠনপাঠনের ধারাও বদলাতে হবে। স্কুলেই হোক বা কলেজেই হোক, বর্তমানে যে ভাবে ক্লাসে পড়ানো হয় তাতে শিক্ষার্থী চুপচাপ বসে শোনে, এবং শিক্ষক অধ্যাপক বক্তৃতা বা ব্যাখ্যা করে যান। শিক্ষার্থীদের তাতে নিক্রিয় থাকবার সুযোগ মেলে এবং শিশু কিশোর বা তরুণের পক্ষে নিক্রিয় বসে থাকার চেয়ে বড় শাস্তি আর কিছুই নেই। বস্তুতপক্ষে তারা নিক্রিয় বসে থাকেও না। ক্লাসে মাস্টারের কথা শোনা ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই বলে তাদের মন তখন নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে গল্প চলে, একজন শিক্ষার্থী আরেকজন শিক্ষার্থীর কাছে কাগজ-পেন্সিল চালান করে, কখনো কখনো খোলাখুলিভাবে গল্পগুজব করে বা গোলমাল বাধিয়ে দেয়। শিশুকে সক্রিয় রাখতে না পারলে শিক্ষা কার্যকরী হয় না, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের শিশু-শিক্ষা-ব্যবস্থায় এ কথার স্বীকৃতি মেলে। শিশুদের কাজে মাতিয়ে রাখার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হয় এবং তার ফলে তারা খুশী মনে অনেক বেশী শেখে। কিণ্ডারগার্টেন বা কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় ছাড়া সাধারণ বিদ্যালয়েও আজকাল তাই শিশুদের করণীয় নানা কাজের ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশে বুনিয়াদী শিক্ষাও এ সত্যকে স্বীকার করেছে। বুনিয়াদী স্কুলে শিশুকে নানা ধরনের হাতের কাজ দেওয়া হয়, ক্লাসের নানা প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি তাদের নিজেদের দেখতে হয়, ফলে অলস হয়ে বসে থাকবার সময় মেলে না। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন। কলেজের পাঠেও আমাদের দেশের বর্তমান ব্যবস্থার বদলে শিক্ষার্থী যাতে নিজের চেষ্টায় নিজের পরিশ্রমে বিদ্যালাভ করতে পারে সে ধরনের ব্যবস্থা

অবলম্বন করতে হবে। পাঠচক্র, সেমিনার বা টিউটোরিয়াল প্রভৃতি নানা ব্যবস্থায় ছাত্রদের সক্রিয় হতে হয় বলে তার ফলে যে শিক্ষার স্তরের উন্নতি হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বস্তুতপক্ষে বর্তমানে শিক্ষার যে ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রচলিত, শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষকের মেহনত বাড়ানোই যেন তার লক্ষ্য। স্কুলে শিক্ষক আঁক কষে দেন, শিক্ষার্থীরা তা টুকে নেয়। শিক্ষক বই পড়ে যান, ছাত্রেরা চুপচাপ শোনে। কলেজেও সেই একই রীতি। অধ্যাপক সারা ঘণ্টা বক্তৃতা করে যান, ছাত্রেরা শোনে অথবা শোনে না। কঠিন কঠিন বিষয় অধ্যাপক নোট বলে দেন, ছাত্রেরা তা টুকে নেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ সব নোট বাজারে সস্তা দরে কিনতেও পাওয়া যায়। ফলে ক্লাসে ছাত্রদের বিশেষ কিছু করণীয় বা তাদের শক্তি ও উদ্যমের কোন ব্যবহার নেই। কিশোর-বয়সে নিষ্ক্রিয় বসে থাকা যায় না, তাই বিদ্যাশিক্ষায় উদ্যমের সদ্ব্যবহারের বদলে নানা ধরনের অপ্রয়োজনীয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয় কাজে সে উদ্যমের অপব্যয় হয়।

অন্যান্য দেশের মতন আমাদের দেশেও শিক্ষকের কাজের বোঝা হালকা করে শিক্ষার্থীর পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়াতে হবে। শিক্ষকের কাজের বোঝা কমালে দু-ভাবে লাভ হবে। এক তো তার ফলে শিক্ষক ছাত্রদের পড়ালেখার যথাযথ তত্ত্বাবধান করতে পারবেন। বর্তমানে যে ক্লাসে বক্তৃতা বা ব্যাখ্যা করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়, তখন তার বদলে ছাত্ররা কতখানি বুঝেছে, না বুঝে থাকলে তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা শিক্ষকের কর্তব্যের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে। আজকাল ক্লাসে পরীক্ষা নিলেও খাতাগুলি নেহাত বেগার ঠেলা ভাবে দেখা হয়, ভাল করে দেখবার

শিক্ষকের সময় কই? কিন্তু ক্লাসে পড়াবার বোঝা কমলে এ সব অবশ্য করণীয় কর্তব্যের জন্য উপযুক্ত সময় মিলবে। দ্বিতীয় লাভ হবে এই যে, শিক্ষক নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি বা শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে পারবেন। বর্তমানে শিক্ষকের অবসর বা অবকাশ এত কম যে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোন বই পড়বার বড় একটা সুযোগ বা সময় মেলে না। গত দু তিন বৎসর যে সমস্ত হেডমাস্টারদের সেমিনার করা হয়েছে, সেখানে বহু হেডমাস্টার স্বীকার করেছেন যে ট্রেনিং স্কুল বা কলেজ ছাড়বার পরে এই প্রথম তাঁরা আবার শিক্ষাসম্বন্ধীয় সাহিত্য পড়বার অবসর বা সুযোগ পেয়েছেন। নিজে শিক্ষার্থী না হলে শিক্ষক হওয়া যায় না। এই যে শিক্ষার শাশ্বত সত্য, আমাদের দেশে বহু শিক্ষকের জীবনে তা অচল বলেই আমাদের দেশে শিক্ষাসংকট আজ এত কঠিন।

শিক্ষকের বোঝা কমাবার পক্ষে একটি প্রধান বাধা দেশের জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণার অভাব। অন্যের কথা দূরে থাক, আইনসভার সদস্যদের মুখেও এমন কথা শোনা গেছে যে শিক্ষকের জীবন নেহাত লোভনীয়, কারণ তাদের খাটুনি অত্যন্ত কম। স্কুল পাঠশালার বেলাতে এ কথা একেবারেই খাটে না, কারণ স্কুলের মাস্টারদের সকলেরই দশটা-পাঁচটা ক্লাস করতে হয়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজ আপাতদৃষ্টিতে কম হলেও বস্তুতপক্ষে আমাদের দেশে তাদের খাটুনি অত্যধিক। এ-দেশে কলেজের অধ্যাপককে সপ্তাহে অন্তত আঠারো-কুড়ি ঘণ্টা পড়াতে হয়। আইনসভার যে সদস্য এ নিয়ে অনুযোগ করেছিলেন, তাঁর মতে দশটা-পাঁচটা পড়ালে এ কুড়ি ঘণ্টাকে অন্তত পঁয়ত্রিশ ঘণ্টায় বাড়ানো চলে। পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা পড়াবার দৃষ্টান্তও যে এ দেশে

একেবারে মিলবে না তা নয়; শুনেছি যে বর্তমানে দুই বা তিন কিস্তিতে কলিকাতা শহরেই কোন কোন অধ্যাপক ত্রিশ-বত্রিশ ঘণ্টা পর্যন্ত পড়িয়ে থাকেন। 'পড়িয়ে থাকা' কথাটার ব্যবহার হয়তো সমীচীন নয়, কারণ সত্যিকার ভাবে পড়াতে হলে কলেজের অধ্যাপককে প্রতি ঘণ্টায় বক্তৃতার জন্য অন্ততপক্ষে দু-তিন ঘণ্টা নিজের পড়তে হয়, তা নইলে নোট বই থেকে পাঠ করা চলে, কিন্তু তার বেশী কিছু করা অসম্ভব। এমনকি দু-তিনখানি বই মিলিয়ে নোট তৈরী করার সময়ও তাঁর থাকে না। সরকারী বা সওদাগরী অফিসে কেরানীর কাজের সঙ্গে যারা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কাজের তুলনা করতে চায়, শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই বলতে হবে।

বিদেশে শিক্ষকের বোঝা লাঘব এবং শিক্ষার্থীকে বেশী খাটিয়ে নেবার জন্য নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে। অক্সফোর্ডে এমন বহু অধ্যাপক আছেন, যাঁরা বৎসরে দশ-বারোটির বেশী বক্তৃতা দেন না। খ্যাতনামা অধ্যাপকদের বক্তৃতার বোঝা আরো কম, কিন্তু যখন তাঁরা বক্তৃতা দেন, তখন তাতে নতুন কিছু শেখবার ও জানবার থাকে বলে তাঁদের বক্তৃতায় কেবল ছাত্রছাত্রী নয়, অন্যান্য শিক্ষকেরাও ভিড় করে আসেন। খ্যাতনামা অধ্যাপকদের কথা বাদ দিলেও নেহাত নতুন শিক্ষককেও সপ্তাহে তিনটি-চারটির বেশী বক্তৃতা দিতে হয় না। ফলে প্রতিটি বক্তৃতা তৈরী করবার জন্য তাঁদের যথেষ্ট সময় মেলে, এবং অধ্যয়ন ও সাধনার দ্বারা শিক্ষক নিজের শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করবার সুযোগ পান। আমাদের দেশে ক্লাসেই যে সমস্ত বিষয় পড়িয়ে দিতে হবে বলে দাবি করা হয়, অক্সফোর্ডে তা-ও স্বীকার করা হয় নাই। বহু বিষয়ে একেবারেই ক্লাসে পড়ানো হয়

না। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের চেষ্টায় লাইব্রেরীর বই থেকে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। কোন বিষয়ে সন্দেহ হলে কেবলমাত্র তখন গিয়ে শিক্ষকের কাছে বোঝবার চেষ্টা করে। এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্র মনে করা হয়। সেখানে সকলেই শিক্ষার্থী, সকলেই নিজের চেষ্টায় নিজের জ্ঞানভাণ্ডার বাড়াবার সাধনায় মগ্ন। অধ্যাপক ও শিক্ষক নিজের নিজের বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণায় মনোযোগী, ছাত্রেরা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের শিক্ষা পূরণে ব্রতী।

অক্সফোর্ডে যে ধরনের টিউটোরিয়াল ও সেমিনার প্রভৃতির ব্যবস্থা, তার প্রচলন না করতে পারলে ঠিক সে শিক্ষার ধারা এ-দেশে চালানো কঠিন। টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থায় প্রতি সপ্তাহে ছাত্র বা ছাত্রী এককভাবে অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ এক বা একাধিকবার পায়, এবং সেই অবসরে শিক্ষক বিগত সপ্তাহের পাঠ বিচার করে আগামী সপ্তাহের জন্য সাপ্তাহিক পাঠ্য বিষয়ের ধারা নির্দেশ করে দেন। সেই নির্দেশ অনুসারে শিক্ষার্থী নিজের সাধনায় শিক্ষালাভ করে বলে সে শিক্ষা তার কাজে সজীব ও সত্য হয়ে উঠে। এবং সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকের নানামুখীন জ্ঞান ও পরিণত বিচার-বুদ্ধির সংস্পর্শে দিনের পর দিন শিক্ষার্থীর নিজের বুদ্ধি ও বিচারের উৎকর্ষ হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে যে গুরু-শিষ্য-সংবাদের মধ্যে গুরুর জ্ঞান শিক্ষার্থীর মনে সঞ্চারিত হত, অক্সফোর্ডের এ টিউটোরিয়াল পদ্ধতিকে তার আধুনিক সংস্করণ মনে করলে অন্যায় হবে না।

সত্যিকার ভাবে টিউটোরিয়াল প্রথা চালাতে হলে শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বাড়াতে হবে। অক্সফোর্ডে প্রতি চার-পাঁচজন

ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক—সে তুলনায় ভারতবর্ষের কলেজী শিক্ষায় প্রতি পঁচিশজন ছাত্রের হিসাবে মোটে একজন শিক্ষক। বর্তমানে আমাদের যে আর্থিক সংগতি তার কথা মনে করলে টিউটোরিয়ালের জন্য ছাত্র-শিক্ষকের যে অনুপাত প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা করা আপাতত বোধ হয় সম্ভব নয়। কিন্তু তবু বর্তমানের ব্যবস্থার খানিকটা বদল প্রয়োজন এবং সম্ভবপর। কলেজে যে-পরিমাণ বক্তৃতা ও ব্যাখ্যার রেওয়াজ তাকে সহজেই কমানো যায়, এবং এ ভাবে শিক্ষক-অধ্যাপকের যে শ্রমলাঘব হবে, ছাত্রগোষ্ঠীর কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য তার ব্যবহার করা চলবে। শুধু তাই নয়, বয়স্ক মেধাবী ছাত্রদের উপর যদি নীচু ক্লাসের ছাত্রদের লেখা-পড়ার ভার খানিকটা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার ফলেও শিক্ষার উন্নতি হতে বাধ্য। আগেকার দিনে ছাত্রদের মধ্যে যারা মাতব্বর বা সর্দার পড়ুয়া হত, তারা এ ভাবে শিক্ষককে সাহায্য করত। অন্যকে পড়াবার চেষ্টায় সর্দার পড়ুয়া ছাত্রের নিজের লাভ হয়, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতের উৎকর্ষ হয় বলে শিক্ষায় সুফল দেয়। কেবল কলেজে নয় স্কুলেও এ ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে শিক্ষার উৎকর্ষ হতে বাধ্য।

বর্তমানে শিক্ষার যে অবনতি ঘটেছে তার অন্যতম প্রধান কারণ ডিগ্রীর প্রতি অহেতুক মোহ। অহেতুক বললে হয়তো অন্যায় হয়, কারণ সরকারের বিধানের ফলেই ডিগ্রীর প্রতি মোহ বেড়েছে। এককালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না থাকলেও সরকারি চাকুরি মিলত, আজকাল অত্যন্ত নীচুমানের দু-চার রকমের কাজ ভিন্ন প্রায় সকল সরকারী কাজের জন্যই ডিগ্রীর কড়ার দেওয়া হয়। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে ডিগ্রীধারীর সংখ্যা বেড়েছে, অত্যন্ত মামুলী কাজের

জন্যও উমেদার বহু—এ সব নানা কারণে হয়তো এ ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে, কিন্তু তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ডিগ্রী-প্রার্থীর সংখ্যা অসম্ভব ভাবে বেড়ে গেছে বলে লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়েছে বেশী। সরকারের দেখাদেখি বহু বেসরকারী কাজেও আজ ডিগ্রীর উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়া হয়।

যদি সরকারী চাকুরিতে ডিগ্রীর কড়ার লোপ বা অন্ততপক্ষে কমিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাতে নানা ভাবে লাভ হবে। এক তো কেবলমাত্র চাকুরির খোঁজে যারা ডিগ্রীপ্রার্থী তাদের সংখ্যা কমে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে যেনতেন প্রকারে ডিগ্রী পাওয়ার জন্য আজকাল কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রেরা অসৎ উপায় অবলম্বন করতেও দ্বিধা করে না, তার প্রয়োজন কমে যাবে বলে শিক্ষায়তনের আবহাওয়া অনেকটা বিশুদ্ধ হয়ে আসবে। অমনোযোগী ও অনিচ্ছুক ছাত্রসংখ্যা হ্রাস এবং শিক্ষাসন্ধানী ছাত্রের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে স্কুল-কলেজগুলি সত্যিকার শিক্ষায়তন হয়ে উঠবে।

ডিগ্রীর কড়ার বাদ দিয়েও যে সরকারী চাকুরিতে ভাল লোক বাছাই করা যায়, ইংলণ্ডে প্রতিদিন তার নমুনা মেলে। ইংরেজদের স্বদেশে বহু সরকারী চাকুরিতেই এ ধরনের ডিগ্রীর কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। সেখানে বয়সের বিচারে বিভিন্ন কাজের জন্য বাছাই হয়, এবং প্রতি স্তরের কাজের জন্য উপযুক্ত বয়সে কিশোর বা তরুণ যুবক নির্বাচিত হয়। তার ফলে সরকারী চাকুরি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দুইয়েরই উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে ভারতবর্ষেও এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও বিচার চলছে। ভারত সরকার এ বিষয়ে বিচার করবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত করেছেন, তার রিপোর্টের কথা আগেই বলেছি। কমিটির রিপোর্ট থেকে এ কথাও জানা যায় যে প্রথম

স্তরের কাজের জন্য সতেরো থেকে উনিশ বছরের কিশোর, দ্বিতীয় স্তরের কাজের জন্য উনিশ থেকে একুশ বছরের তরুণ যুবা এবং উচ্চতম স্তরের কাজের জন্য একুশ থেকে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবজনের নির্বাচনের কথা বর্তমানে সরকারের বিচারাধীন।

এ ধরনের ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে বর্তমানের শিক্ষাপ্রণালীর একটি প্রধান গলদ দূর হবে। আজকাল হরে দরে সবাই গড্ডালিকা প্রবাহে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করে। মাধ্যমিক শিক্ষার যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তা যখন পুরোপুরি কার্যকরী হবে, তখন সতেরো বছরের আগে কারুই কলেজে ভর্তি হবার সম্ভাবনা থাকবে না। কুড়ি বছরের আগে ডিগ্রী পাওয়া তো একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই উনিশ বছরের আগে যদি বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী নিজেদের জীবিকা সংস্থানের পথ খুঁজে পায়, সরকারী এবং বেসরকারী চাকুরিতে দাখিল হয়ে নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে বিশেষ ট্রেনিং বা শিক্ষালাভ করে, তবে লক্ষ্যহীন সাধারণ শিক্ষার স্রোতে খানিকটা মন্দা পড়বে। তেমনি ভাবে উনিশ থেকে একুশ বছরের মধ্যে যদি আর এক দল যুবক-যুবতী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পায়, তবে যারা উচ্চশিক্ষার অভিলাষী বা বিশেষ প্রতিভার অধিকারী, কেবলমাত্র তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আসবে। আশা করা যায় যে এ ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মান ও শিক্ষার ধারায় নতুন উৎকর্ষ দেখা দেবে।

প্রচলিত শিক্ষাধারার আর একটি গলদ সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছে। ভারতীয় রাষ্ট্র প্রজাতান্ত্রিক গণরাজ্য। শিক্ষাজীবন থেকে গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় মানুষ না হলে উত্তরকালে নাগরিক পুরোপুরিভাবে গণতান্ত্রিক হতে পারে না। গণতান্ত্রিক আদর্শ ও তার বিরোধী শিক্ষা ও মনোভাবের দ্বন্দ্বের ফলেই সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের বহু সমস্যার উদ্ভব। তার বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়, কিন্তু অন্তত একটি দৃষ্টান্ত না দিলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে না। আইনের চোখে সকল ভারতবাসী সমান। আমাদের সংবিধান, জাতি-ধর্ম-প্রদেশ-ভাষা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকার করেছে, কিন্তু কার্যত সে আদর্শকে কি আমরা বাস্তব করেছি? ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আমাদের ইতিহাস চিরদিন অসাম্যের ইতিহাস। প্রাচীনকালে আর্যের যে অধিকার ছিল, অনার্য সে অধিকার পায়নি। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের যে অধিকার, শূদ্রের বেলা সে অধিকার স্বীকৃত হয়নি। স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারও আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে মেলে না। মধ্যযুগে পাঠান মোগল রাজত্বেও সেই এক কাহিনী। পাঠান সাম্রাজ্যে পাঠানের যে অধিকার, হিন্দুর কথা তো দূরে থাক, অপাঠান মুসলমানেরও তা সর্বদা মিলত না। মোগল যুগেও মোগল বিশেষ সুবিধার অধিকারী ছিল। সারা মধ্যযুগে সাধারণ ভাবে হিন্দু প্রজা মুসলমান প্রজার সমান অধিকার পায়নি। ইংরেজ আমলেও অসাম্যের রেওয়াজ বলবৎ ছিল। ইংরেজ অপরাধীর ইংরেজ জুরী

তলব করবার অধিকার ছিল, জেলের মধ্যেও ভারতীয় ও ইংরেজ কয়েদীর ব্যবস্থার তারতম্য করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে সমস্ত ভারতীয়ের সমান অধিকারের সূচনা হয়, এবং ১৯৫০ সাল থেকে তা আমাদের সংবিধানের প্রাণমন্ত্র। কিন্তু সংবিধানে স্বীকৃত হলেও আজও আমরা সকলের সমানাধিকারকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি বলেই বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন ভাষাভাষীদের যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরাগ, আইনের চক্ষে সকলের সমানাধিকার আজো আমাদের মজ্জাগত হয়নি বলেই তা সম্ভব হয়েছে।

এ সমানাধিকার বোধকে যদি আমাদের স্বভাবের সহজ প্রকাশে পরিণত করতে চাই, তবে স্কুল-জীবন থেকেই গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। এ কথা অস্বীকার করবার উপায়ই নেই যে বর্তমানে স্কুল-কলেজে গণতন্ত্রের বিশেষ কোন পরিচয় মেলে না। পুরাকালের ভারতীয় সমাজ ছিল কর্তাভজা এবং বর্তমানেও স্কুল-কলেজে কর্তৃপক্ষের প্রভুত্ব প্রতিপদে সুস্পষ্ট। বস্তুতপক্ষে এ দেশে প্রভুত্ব ধর্মী আবহাওয়া এত প্রবল যে, যে সমস্ত ক্ষেত্র একান্তভাবে ছাত্রদের এলাকা, সেখানেও ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশ করবার সুযোগ পায় না। স্কুল কলেজে বিতর্ক সভা, ছাত্রদের নিজেদের লাইব্রেরী, বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি-পরিষদ, নাট্য-সমিতি প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা স্বরাজ্যস্থাপন ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করতে পারে, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে এ সব ক্ষেত্রেও ছাত্রদের পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। বর্তমান ছাত্রবিক্ষোভের অন্যতম কারণও এখানে মিলবে। নিজেদের ক্ষেত্রেও যদি তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারে,

তবে স্বক্ষেত্রের বাইরেও যে সময় সময় তাদের বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়ে উঠবে, তাতে বিচিত্র কি? পূর্বের অন্ধ স্বীকৃতির বদলে ভারতীয় যুবসমাজের মনে আজ অন্ধ অস্বীকারের দাবি উঠেছে। স্বক্ষেত্রে বিকাশের সুযোগ পায় না বলেই এ অন্ধ উচ্ছ্বাস ও বিদ্রোহ।

ছাত্রজীবনের অপেক্ষাকৃত পরিমিত ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যশিক্ষা সমাজের পক্ষেও কল্যাণকর। ভুল না করে কেউ সত্য পথ আবিষ্কার করতে পারে না, সমস্ত অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দেয়। পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা সামাজিক ক্ষেত্রে যদি নতুন করে এ সব সত্য শিখতে হয়, তবে তাতে সমাজের ক্ষতির আশঙ্কা সমূহ। তাই নানা ধরনের অভিজ্ঞতার হাতেখড়ি ছাত্রজীবনে হওয়াই কাম্য। নিজেদের সভাসমিতি, খেলাধুলার ব্যবস্থায় যদি তরুণ বয়সে ছাত্রেরা এ সব ধরনের কাজে হাতে-কলমে শিক্ষা পায়, তবে পরবর্তী জীবনে সমাজের লাভ। শুধু তাই নয়। এ ধরনের সুযোগ ছাত্রজীবনে না পেলে কেবল যে তারা অনভিজ্ঞই থেকে যায় তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে যে বিক্ষোভ সঞ্চিত হতে থাকে, বাইরের বাঁধন দূর হয়ে যাওয়া মাত্র তা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যে সমস্ত স্কুল-কলেজে ছাত্রদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ-সুবিধা যত বেশী, সে সব স্কুল-কলেজে ছাত্রবিক্ষোভ বা অনুশাসনহীনতা তত কম। দায়িত্ব স্বীকার করলেই দায়িত্ববোধ বাড়ে। এবং দায়িত্ববোধ যত বাড়ে অনুশাসনহীনতার সম্ভাবনা তত কম হয়ে আসে।

ছাত্রদের দায়িত্ববোধ প্রবল করবার নানা উপায় রয়েছে। তাদের সবগুলির উল্লেখ করা সম্ভব নয়, কিন্তু বিলেতের বহু স্কুলে প্রচলিত একটি রীতি এ দেশেও কার্যকরী হতে পারে। সেখানে

স্কুলগুলি বিভিন্ন ভবনে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ভবনের নেতা এক বা একাধিক ছাত্র। শিক্ষকেরাও বিভিন্ন ভবনে বিভক্ত হন, কিন্তু প্রতি ভবনের কৃতিত্বের দায়িত্ব প্রধানত ছাত্রনেতার উপরই ন্যস্ত হয়। কেবলমাত্র লেখাপড়ায় উৎকর্ষ বিচার করে নেতা নির্বাচন করা হয় না, চরিত্র ও নেতৃত্বগুণের উপর সবচেয়ে বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়। একবার নেতা নির্বাচিত হলে সারা বৎসরের জন্য তার নির্দেশ সবাইকে মানতে হয়, এবং বিভিন্ন ক্লাসের নেতাদের মিলিয়ে ভবনের নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন ভবনের নেতাদের নিয়ে সারা স্কুলের নেতৃত্ব সংগঠিত হয়। হেডমাস্টার থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষকই এ সব নেতাদের যথেষ্ট খাতির করেন বলে তাদের নেতৃত্ববোধ আরো দৃঢ় হয় এবং দায়িত্বজ্ঞান বেড়ে যায়। বহুক্ষেত্রে স্কুলের অনুশাসন ব্যবস্থা এ নেতৃবৃন্দের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কোন গাফিলতি করলে তার বিচার করে ক্লাস অথবা ভবন অথবা স্কুলের ছাত্রনেতা। গুরুতর কোন দোষ ত্রুটি ঘটলে তখন ছাত্রনেতারা নিজেরাই হেডমাস্টারকে জানিয়ে তাঁর নির্দেশ প্রার্থনা করে

এ ভাবে স্কুল কলেজে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টি করলে নানাভাবে সমাজের লাভ। পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং সমস্ত সমাজের কল্যাণসাধন ভিন্ন গণতান্ত্রিক সমাজ টিকতে পারে না। ছাত্রজীবনে এ সব আদর্শ সহজাত করে না তুললে পরবর্তী জীবনে তাদের গ্রহণ করা কঠিন। পূর্বেই বলেছি, যে ভুলচুক যদি করতেই হয়, তবে ছাত্রজীবনের পারমিত ক্ষেত্রে ভুলচুক করলে সামাজিক প্রমাদের সম্ভাবনা কম। তা নইলে এ সব শিক্ষা যদি সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে লাভ করতে হয়, তবে

সঙ্কট ঘটবার আশঙ্কা থাকে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের অধিক পরিমাণে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দিলে যে সমস্ত লাভ হবে, তার মধ্যে কেবল দু তিনটির উল্লেখ করলেই চলবে। ছাত্রদের উপর কাজের ভার চাপলে তারা ব্যস্ত থাকবে বলে অকাজের দিকে মন ঝুঁকবে না। নিজেদের সভা-সমিতি সংগঠন চালিয়ে তারা নাগরিক বৃত্তি শিক্ষালাভ করবে, এবং ফলে পরবর্তী জীবনে অনেক ভুলভ্রান্তি এড়িয়ে যেতে শিখবে। স্বনির্বাচিত কাজ করার যে আনন্দ তা লাভ করবে বলে তাদের ছাত্র-জীবন সার্থক হবে, এবং কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে তারা আত্মোপলব্ধি করতে শিখবে। সমস্ত মিলিয়ে তাদের জীবন সংহত ও সুশৃঙ্খল হবে, এবং ফলে সমগ্র সমাজের অনুশাসন সক্রিয় ও সজীব হয়ে উঠবে।

১২

ছাত্রসমাজে অসন্তোষ ও অনুশাসনহীনতার যে সব কারণের আলোচনা এ পর্যন্ত করেছি, তার সামাজিক পশ্চাৎপটের দিকেও বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিক জগতে বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র যে ভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনো তা ঘটেনি। পুরাকালে বিভিন্ন আদর্শ বা বিশ্বদৃষ্টির এ রকম সমাবেশ কখনো হয়নি, হতে পারত না। কাজেই বিভিন্ন সমাজ নিজ নিজ ধর্ম, আচার বা আদর্শ অনুসারে ব্যক্তির জীবনযাত্রা নির্দেশ করেছে। আজ আর তা সম্ভব নয়। বিভিন্ন আদর্শ ও জীবনদর্শনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অস্বীকার করতে চাইলেও তার প্রতিক্রিয়া এড়াবার উপায় নেই। আজ তাই দেশে দেশে ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে নতুন অনিশ্চয়তা

ও লক্ষ্যভ্রান্তির পরিচয় মেলে। সমাজ যেখানে দিশেহারা, সেখানে যে সমাজের যুবমানসও বহুক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

বর্তমানে ছাত্রসমাজের মধ্যে যে আদর্শহীনতা মাঝে মাঝে দেখা দেয়, সমাজের আদর্শহীনতা ও লক্ষ্যভ্রান্তির অঙ্গ হিসাবেই তাকে বুঝতে হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ছাত্র ও যুবসমাজ বোধ হয় সবচেয়ে, বেশী সচেতন ও সংবেদনশীল। শৈশবে বা যৌবনান্তে পৃথিবীর দ্বন্দ্বসংঘাত মনকে তত গভীরভাবে স্পর্শ করে না। শিশুমন নিজের স্বপ্নজগতে বাস করেই তৃপ্তি পায়। যৌবনশেষে পৃথিবীর নানা ঘাত প্রতিঘাত সয়ে চিত্তের সূক্ষ্ম অনুভূতি পূর্বের মত তীক্ষ্ণ থাকে না। অভিজ্ঞতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সহনশীলতা ও পৃথিবীকে বোঝার শক্তি বাড়ে, কিন্তু সংবেদনার শক্তি কমে আসে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অনুভূতি এবং সংবেদনার তীক্ষ্ণতা না কমলে মানুষের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাও কঠিন হত। যৌবনের চেতনায় তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও আবেগের তীব্রতা এত প্রবল বলেই যৌবন এত সহজে নতুনের আহ্বানে সাড়া দেয়। তাই চিরদিন সমস্ত বিপ্লব ও পরিবর্তনে যুবসম্প্রদায়ই অগ্রদূতের ভূমিকায় দেখা দিয়েছে।

ছাত্রসমাজের মধ্যে আদর্শহীনতার প্রকাশ তাই সাম্প্রতিক সমাজের আদর্শচ্যুতির প্রত্যক্ষ ফল। সমাজে যদি অর্থের লোভ প্রবলভাবে দেখা দেয়, স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা যদি অভিজ্ঞ বিজ্ঞজনকেও বিভ্রান্ত করে, তবে সে দূষিত আবহাওয়ায় তরুণ মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখবে কি করে? সমাজকে বাদ দিয়ে ছাত্রসমাজকে উন্নত করবার চেষ্টা তাই বাতুলতা। বস্তুতপক্ষে

সামাজিক পরিবেশেই শিক্ষা বা শিক্ষার্থীর বিকাশ। শিক্ষা যে কি তার সংজ্ঞানির্দেশ করবার নানা চেষ্টা হয়েছে। তার পরিপূর্ণ বিবরণ সহজে দেওয়া যায় না, কিন্তু সকলেই বোধ হয় স্বীকার করবেন যে সমাজের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার দ্বারা ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানে সমস্ত পৃথিবী একই সমাজের অঙ্গ, তাই বিশ্বমানবের অভিজ্ঞতা আজ প্রতি ব্যক্তির শিক্ষণীয়, কিন্তু অভিজ্ঞতার এ বিরাট সমাবেশের মধ্যে যদি আদর্শের ঐক্য খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে জীবনযাত্রার পথে শিক্ষা আলো এনে দেবে না, বরং জীবনপথে এক দুর্বিষহ বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের মধ্যে আদর্শের ঐক্য স্থাপন করতে হলে তার জন্য নতুন মাপকাঠি চাই। মূল্যবোধ সম্বন্ধে নতুন চেতনার সঞ্চার না হলে সে মাপকাঠি মিলবে না। বর্তমানের যুব ও ছাত্র-সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি ও লক্ষ্যহীনতা দূর করতে হলে তাই আজ সমাজের প্রত্যেক অঙ্গে এবং প্রত্যেক স্তরে নতুনভাবে মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।

পূর্বেই বলেছি যে শিক্ষাবৃত্তির অনাদর বর্তমান জগতের মূল্যবিভ্রান্তির অন্যতম লক্ষণ। সাম্প্রতিক সমাজ যে শিক্ষকবৃত্তিকে অবহেলার চোখে দেখে, শিক্ষকের অর্থাভাব তার প্রধান কারণ। আমরা হয়তো একথা স্বীকার করতে চাই না, কিন্তু এই মনোভাবের পিছনে অর্থের প্রতি যে মোহ, ভারতবর্ষে আজ তা প্রবল হয়ে উঠেছে। আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে ভারতবাসী আধ্যাত্মিক, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি বা সমাজের তুলনায় এদেশে মূল্যবোধ ও আদর্শবাদ প্রবল। শিক্ষক ও শিক্ষকবৃত্তির প্রতি আমাদের যে মনোভাব তাতে কিন্তু এ দাবি মানা কঠিন।

বস্তুতপক্ষে ইংলণ্ডে অথবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আজও শিক্ষকের যে মর্যাদা ও সম্ভ্রম, তার সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের আধ্যাত্মিকতার দাবি টেকে না। অর্থ ও বিত্ত দিয়ে আজ আমরা সামাজিক মর্যাদার বিচার করি। তার ফলে যে কেবল শিক্ষকের ইজ্জত কমেছে তা নয়, সমস্ত সমাজে আদর্শহীনতা ছড়িয়ে পড়েছে। শৈশব থেকে শিক্ষার্থী শোনে এবং পড়ে যে অর্থ দিয়ে মানুষের বিচার করা চলে না, বিভিন্ন বৃত্তির মর্যাদা বা ইজ্জত অর্থাগমের উপর নির্ভর করে না, গুরু দরিদ্র হলেও শীর্ষস্থানীয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তারা দেখে যে গুরু বা শিক্ষকের স্থান সমাজের নীচু কোঠায়। কথা ও কাজের মধ্যে যেখানে এতখানি তফাৎ, সেখানে তরুণের বিশ্বাসের ভিত্তি অটল থাকবে কি করে? ফলে তারা শৈশব থেকেই দৈনন্দিন জীবনের দাবি এবং আদর্শ ও মূল্যবোধের আহ্বানকে স্বতন্ত্র করে দেখতে শেখে, ভাবে যে এ সব বড় বড় বুলি সময় ও সুবিধামত মন্ত্র উচ্চারণের জন্য, কিন্তু প্রতিদিনের জীবনের শত শত ছোটখাট কাজে তাদের কোন প্রয়োজন নেই।

বিক্ষুব্ধ ও আদর্শভ্রষ্ট শিক্ষকের ব্যবহারে আদর্শ ও বাস্তবের অন্তর আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। শিক্ষার্থী স্বভাবতই শিক্ষককে গুরু বলে শ্রদ্ধা করতে চায়। সমাজে শিক্ষকের যে অনাদর তার ফলে তার সে স্পৃহা প্রথম ধাক্কা খায়। কিন্তু এ প্রতিকূল অবস্থায়ও শিক্ষক যদি নিজের আদর্শবোধ বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, তবে শিক্ষকের চরিত্রবল ও ধনমানের প্রতি নিস্পৃহতা শিক্ষার্থীর মনে আরো বেশী দাগ কাটে। এ রকম একাগ্রচিত্ত ও নির্লোভ শিক্ষকের অভাব আজও নেই, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক

শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করার ফলে সকল শিক্ষকের পক্ষে এ আদর্শ পুরোপুরি বজায় রেখে চলা কঠিন। লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের মধ্যে ভালো মন্দ সব রকম লোকেরই পরিচয় মেলে। কিন্তু শিক্ষকের অকস্মাৎ সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বর্তমান জগতে সংসার চালানোর নানা অসুবিধার দরুন আদর্শবাদী নির্লোভ শিক্ষকের অনুপাত যে কমে গেছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যদি শিক্ষক-সম্প্রদায়ে আদর্শহীন লোকের সংখ্যা বেড়ে যায়, তবে তার ফলে যে কেবল শিক্ষার ক্ষতি হয় তা নয়, সমস্ত সমাজের ভবিষ্যৎ সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে। শিক্ষার ফল সুদূরপ্রসারী কিন্তু আপাতদৃষ্ট নয় বলেই সমাজ এ সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন নয়। আজ যদি শিক্ষকের চরিত্র ও শিক্ষার মান কমে যায়, তবে তার বিষময় ফল পুরোপুরি দেখা দেবে বিশ ত্রিশ বৎসর পরে। তেমনিভাবে আদর্শবান ও কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষকের সেবায় সমাজের যে মহৎ লাভ, তাও বহুদিন স্পষ্টভাবে ধরা দেবে না। শিক্ষার ফল দীর্ঘদিন পরে বোঝা যায় বলেই সমাজ শিক্ষককে অবহেলা করতে পারে, কিন্তু একদিন এ অনাদরের দাম সমাজকে সুদে আসলে শোধ করে দিতে হয়।

শিক্ষকের মর্যাদা ফিরিয়ে আনবার যে সব উপায়ের কথা আগে উল্লেখ করেছি, সেগুলি অবলম্বন করলে যে কেবল শিক্ষকের আত্মসম্ভ্রম ফিরে আসবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসমাজের আদর্শভ্রষ্টতার একটি প্রধান কারণ লুপ্ত হবে। নিষ্ঠাবান শিক্ষকের ছাত্র তাঁর জীবনের উদাহরণ দেখে নিষ্ঠা শিখবে। চরিত্রবান শিক্ষকের ছাত্র তাঁর সংস্পর্শ এসে চরিত্রবান হবে। জ্ঞানান্বেষী শিক্ষকের উদাহরণ ছাত্রের মনে জ্ঞানানুরাগ এবং অনুসন্ধিৎসার সঞ্চার করবে। এ কথাও বলা চলে যে, সাধারণত খানিকটা আদর্শবাদ না থাকলে কেউ শিক্ষক হতে

চায় না। সমাজের অন্য পরিবর্তন যতই হোক না কেন, সাম্প্রতিক অর্থ বা ক্ষমতার বিচারে শিক্ষক খানিকটা পিছিয়ে থাকতে বাধ্য। তাই যারা অর্থপ্রিয় বা ক্ষমতালোভী, তারা স্বেচ্ছায় শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে না। বর্তমানে যে শিক্ষক সম্প্রদায় বহুক্ষেত্রে আদর্শভ্রষ্ট তার মুখ্য কারণ অভাবের তীব্রতা। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে মনুষ্যধর্মকে পুরোপুরি বাঁচিয়ে রাখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, এবং জাতীয় শিক্ষাধারার প্রবর্তনের ফলে যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা লক্ষের কোঠায় পৌছয়, সেখানে অধিকাংশ শিক্ষক সাধারণ মানুষ হতে বাধ্য। অভাবের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলে তাঁরা শিক্ষক-সুলভ আদর্শবাদ ফিরে পাবেন, এ আশা করা তাই অন্যায় হবে না।

পূর্বেই বলেছি যে ছাত্রজীবনে ব্যক্তি সমাজের কাছে ঋণী। ভারতবর্ষে প্রতি ব্যক্তির মাথাপিছু আয় বৎসরে তিন শ টাকাও নয়, অথচ স্কুলের ছাত্রেরও বাৎসরিক খরচ প্রায় পাঁচ শ ছয় শ টাকা। কলেজে ইউনিভার্সিটিতে প্রতি ছাত্রের সমস্ত খরচ হাজার টাকা বা তারো বেশী। অথচ ছাত্রাবস্থায় কিশোর বা যুবক সমাজকে কিছুই দেয় না। তাই অন্যের পরিশ্রম ও অর্জিত অর্থের দ্বারাই ছাত্রাবস্থার দাবি মেটাতে হয়। ছাত্রাবস্থার শেষে যদি কিশোর বা যুবক সমাজকে অধিক সেবা করতে পারে, তবেই ছাত্রজীবনে সমাজের গড়পড়তা খরচের দ্বিগুণ বা তিনগুণ এ খরচকে সার্থক মনে করা চলে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বলা হত যে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ছাত্রাবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেকে তৈরী করে গার্হস্থ্য জীবনে সমাজের সেবা করতে হবে, এবং যে এ ভাবে সমাজকে সেবা করেনি, তার মুক্তির অধিকার নেই।

সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং সমাজ সেবার মনোভাব

ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত করতে হলে শিক্ষকের কেবল উপদেশ দিলে চলবে না। কথায় এবং কাজে, আদর্শে ও ব্যবহারে, বিশ্বাসে এবং আচারে ঐক্য স্থাপন করতে হবে। শিক্ষক যেদিন নিজের জীবনে এ সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, সেদিন ছাত্র-সমাজের বিভ্রান্তি ও অনুশাসনহীনতার মূল উৎপাটিত হবে, সমাজের বর্তমান আদর্শহীনতা দূর হয়ে যাবে। যেখানে ছাত্রসংখ্যা অল্প এবং শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও সহজ, সেখানে সমাজ চেতনা উদ্বুদ্ধ করবার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজকাল ছোট ছোট গ্রাম ভেঙে বড় শহর তৈরী হচ্ছে, ছোট ছোট স্কুল পাঠশালা একত্রিত করে বিরাট বহুমুখী স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাই এ অবস্থায় ছাত্রদের মনে সমাজ-চেতনা উদ্বুদ্ধ করবার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষে আজ মানব-সমাজকে নতুন করে ঢালবার চেষ্টা চারিদিকেই দেখা যায়। পুরাতন সামাজিক অন্যায় ও অসাম্য দূর করে নতুন সমাজতান্ত্রিক গণ-আদর্শ স্থাপিত করবার প্রয়াসে গ্রাম ও শহর নতুনভাবে গড়ে উঠেছে। কিশোর ও তরুণের সামনে আজ যে মহৎ মানবিক আদর্শ, ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীতে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের নয় বরং সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য জনগণমন-অধিনায়কের যে উদ্দীপ্ত উদ্বোধন, সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারলে মনের সমস্ত গ্লানি এবং কালিমা মুহূর্তে দূর হয়ে যাবে। আদর্শবাদী তরুণ স্বভাবতই এ আহ্বানে সাড়া দিতে চায়, কিন্তু নানা সামাজিক বাধা ও নিষেধের ফলে কখনো কখনো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বৃহত্তর কর্মের মধ্যে আত্মনিবেদনই যে মানবজীবনের সার্থকতা, এ কথা ছাত্রসমাজের মনে গেঁথে দেওয়াই আজ শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য।

কৈশোরের ধর্ম আত্মোৎসর্গ। শৈশবের শেষে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য, কিন্তু তার চেয়েও বেশী উল্লেখযোগ্য আবেগের আকস্মিক বিকাশ। নিজের স্বার্থকে অতিক্রম করে সমাজের জন্য ব্যক্তির আত্মদান, আদর্শের প্রেরণায় জীবনের সুখ-স্বপ্ন বিসর্জন একান্তভাবে কৈশোর ও যৌবনের লক্ষণ। দেশে দেশে যুগে যুগে তরুণ নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছে, নতুন সমাজ সৃষ্টির সাধনায় অকুণ্ঠ উৎসাহে আত্মদান করতে এগিয়ে এসেছে। মহাযুদ্ধের ফলে সমাজের আদর্শচ্যুতির কথা আগে বলেছি, কিন্তু যুদ্ধের কালো মেঘের মধ্যেও তরুণের আত্মদানস্পৃহা বিদ্যুৎশিখার মতন ঝলসে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে তরুণচিত্ত ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে বিশ্বশান্তির স্বপ্ন দেখেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দেশে দেশে তরুণ চায় যে মানবিক অধিকারের ভিত্তিতে সকল দেশের সকল মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী সমস্ত ব্যবধান অতিক্রম করে এক সম্মিলিত বিশ্বরাষ্ট্র গড়ে তুলুক। হৃদয়কে স্পর্শ করে, চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে এবং উৎসাহকে উদ্দীপ্ত করে, এ রকম আদর্শ তরুণের সামনে তুলে ধরলে তরুণ চিরদিন তাতে সাড়া দেবে। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ বহু যুগের বহু গ্লানি, বহু অসাম্য ও অন্যায়কে দূর করে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে নতুন গণতন্ত্র গড়ে তুলবার সাধনায় মগ্ন—সেই সাধনার আগুন যদি একবার তরুণ সম্প্রদায়ের মনকে স্পর্শ করে, তবে তাদের জড়তা, আলস্য এবং অনুশাসনহীনতা মুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের শিক্ষকের পক্ষে তাই ছাত্রসমাজের অসন্তোষ বা অনুশাসনহীনতা নিয়ে অনুযোগ করা সাজে না। তাঁদের পক্ষে এ অভিযোগ করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে তাঁরা তরুণসমাজের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেননি, নিজের কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ বা অসার্থক হয়েছেন।

দুঃখকষ্টের ভয়, এমনকি মৃত্যুভয়ও তরুণকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না, বরং তরুণ বয়সে বিপদের মোহ হৃদয়কে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। প্রায় সর্বত্রই দেখা গেছে যে গুপ্ত সমিতি গঠনে বা কঠিন কর্তব্যসাধনে তরুণ ও কিশোরই এগিয়ে আসে প্রথম। তরুণ মনের এ স্বাভাবিক ধর্মকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারলে কিশোর ও যুবককে কঠিন তপস্যায় ব্রতী করা কঠিন নয়। কৈশোরের শেষে এবং যৌবনের প্রাক্কালে অনেকের মনে যে ধর্মবোধ প্রবলভাবে জেগে ওঠে, তাও কৈশোরের এই অসাধ্যসাধনের প্রয়াসের অঙ্গ। ধর্মের বাহ্যিক প্রকাশে নানা প্রভেদ বলে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ধর্মকে আমরা পৃথক মনে করি, এমন কি আচার ও সংস্কারের বিভিন্নতার জন্য মানুষে মানুষে সংঘাতও লেগে যায়, কিন্তু ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য বিচার করলে দেখা যাবে যে বিরাট বিশ্বসত্তার সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য-সাধনই সমস্ত ধর্মের মর্মকথা। নিজেকে অতিক্রমণের এই সাধনায় সমস্ত ছোট ছোট স্বার্থ, ছোট ছোট প্রয়াসকে বর্জন করতে হয় বলে ধর্ম ব্যক্তিকে বিরাট মুক্তি এনে দেয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লাভ-ক্ষতির হিসাব, আগু-পিছুর বিচার আমাদের কর্মপ্রেরণাকে সংকীর্ণ এবং বহুক্ষেত্রে ব্যর্থ করে তোলে। ধর্মের বিরাট আহ্বানে ব্যক্তিত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় বলে মানুষ একই সাথে কর্মপ্রেরণা ও শান্তি খুঁজে পায়। সমাজ বা পৃথিবীর স্বার্থের প্রয়োজনে যে নিজের স্বার্থকে বিসর্জন করতে পারে, সে চিরদিনই শক্তিমান। ধর্মের আহ্বানে যে বিশ্বশক্তির মধ্যে নিজেকে বিলীন করতে পারে, সে কেবল শক্তিমান নয়, সার্থক এবং সিদ্ধপুরুষ।

কিশোর বয়সে ছাত্রদের মধ্যে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা প্রবল, তাই ধর্মজীবনের এ শাশ্বত সত্য কিশোর বয়সেই তাদের মনে সঞ্চারিত

করতে হবে। এ কথার অর্থ এ নয় যে বিভিন্ন ধর্মের অনুষ্ঠান বা আচার নিয়ে কিশোর সম্প্রদায় তৎপর হয়ে উঠবে। আচার বা অনুষ্ঠান বহুক্ষেত্রে মুক্তির বদলে নতুন বাধা-নিষেধের বন্ধন নিয়ে আসে। এ কথার অর্থ এই যে ধর্মের বিরাট আত্মোৎসর্গের সাধনা কিশোরচিত্তের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠুক। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ধর্মের মূলে যে মানবিক আদর্শ, যে শাশ্বত সত্য যুগে যুগে সত্যদ্রষ্টা ঋষি নবী পয়গম্বরদের উদ্বুদ্ধ করেছে, কিশোর বয়সে যদি ছাত্রসমাজ সেই সমস্ত আদর্শ, সেই সব মহাসত্যের সন্ধান পায়, তবে তাদের জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। পৃথিবীর কঠিন পথে চলবার জন্য এ সমস্ত আদর্শের চেয়ে উপযুক্ত পাথেয় কিছুই নেই।

নানাভাবে ছাত্রসমাজের মনে এই ধর্মবোধ উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। অনেক স্কুল-কলেজে প্রতিদিন নিয়মিত পাঠক্রম শুরু হবার আগে সমস্ত ছাত্রছাত্রী একত্র সম্মিলিত হয়। অধ্যক্ষ বা কোন শিক্ষক, বা কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে কেউ কোন ধর্মগ্রন্থ বা মহৎ-সাহিত্য থেকে কিছু পাঠ করার পরে সবাই খানিকক্ষণ নীরবে আত্মসমাহিত হবার চেষ্টা করে। এ ধরনের সমাবেশের সুফল নানা ভাবে দেখা দেয়। প্রতিদিন একত্র হয়ে পাঠ বা চিন্তার ফলে সকলের মনে গোষ্ঠীবোধ সজাগ হয়ে উঠে, মহৎ চিন্তার সাহচর্যে প্রত্যেকের মন ও হৃদয় উন্নত হয়। যদি পাঠক্রম যথাযথভাবে বেছে নেওয়া যায়, তবে এ ধরনের প্রতিদিনের সমাবেশের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্য দিনে দিনে প্রত্যেক ছাত্রের কাছে বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠবে।

সকল মানুষের ঐক্য ও সাম্যকে স্বীকার করার প্রয়োজন আজ যত প্রবল হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কোনদিন তা হয়নি।

পুরাকালে বিশ্বসাম্য বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব কবি ও আদর্শবাদীর কল্পনার বিষয় মাত্র ছিল, কিন্তু বর্তমান যুগে তার স্বীকৃতি মানুষের বাঁচবার একমাত্র উপায়। ছাত্রবয়সে যদি এই বিশ্বসাম্য ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ তরুণের মনে সঞ্চারিত না হয়, তবে সংঘাতের ফলে বর্তমান সভ্যতার বিনাশ বোধ হয় অনিবার্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইতিহাস ও জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলাতে হবে। মানুষের ইতিহাসে প্রতিযোগিতা ও সহযোগের কি ফল সে বিষয়েও নতুন করে বিচার করতে হবে। এ পর্যন্ত প্রায় সকল দেশেই জাতীয় ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে অন্য জাতির প্রতি খানিকটা বিরাগ বা অবহেলা ইতিহাসের অঙ্গ মনে করা হত। আজ বিভিন্ন জাতির পরস্পরের সম্বন্ধকে এক বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে হবে। এ কথার অর্থ ইতিহাসের বিকৃতি নয়—সত্যকে অস্বীকার বা বিলুপ্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য—এ কথার অর্থ শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। পূর্বে জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গিতে যে ঘটনার বিচার হয়েছে, আজ পৃথিবীর বৃহত্তর স্বার্থসিদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে তার বিচার করতে হবে। তার ফলে আমাদের অনেক ধারণা বদলে যাবে, পুরাতন অনেক মূল্যবিচারে পরিবর্তন আসবে। সঙ্গে সঙ্গে সত্যকে প্রকাশ করবার ভঙ্গিরও খানিকটা বদল হবে। সত্য এবং নিছক সত্যকে প্রকাশ করাই ঐতিহাসিকের কাজ, কিন্তু সমস্ত সত্যকে একেবারে সকলের কাছে প্রকাশ করার চেষ্টা বহুক্ষেত্রে মূঢ়তা। বর্তমানেও সকল কথা সকলকে আমরা সর্বত্র বলি না। শিশুর জন্য লিখিত ইতিহাসে হিংসা দ্বেষ ও দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তুলে কোন লাভ নেই। বড় হয়ে বিভিন্ন ঘটনার বৃহত্তর পরিবেশে এ সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিহাসও

তাকে পড়তে হবে, কিন্তু শৈশবে মানুষের মহৎ ঐক্য-সাধনার ইতিহাসই যেন তার কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বস্তুতপক্ষে, মানুষের সামগ্রিক ইতিহাসে দ্বন্দ্বের চেয়ে সহযোগই প্রবলতর শক্তি। মানুষের ইন্দ্রিয় দুর্বল, অন্যান্য জীব জন্তুর তুলনায় মানুষ জীবন যুদ্ধের জন্য অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী, তবুও যে মানুষ সমস্ত প্রাণিজগতের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করেছে, পারস্পরিক সহযোগ তার একমাত্র কারণ। মানুষের ভাষা বোধ হয় এ সহযোগের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর কোন প্রাণীই মানুষের মত ভাষা বিকশিত করতে পারেনি এবং ফলে মানুষের কাছে হার মেনেছে। মানব সমাজের এই অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সহযোগ ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত করতে না পারলে শিক্ষকের কর্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে

পূর্বেই বলেছি যে সমাজে আদর্শবোধ জাগ্রত না হলে কেবল ছাত্রদের মধ্যে আদর্শবোধ সঞ্চারিত করা কঠিন। তরুণ ছাত্রদের মধ্যে যদি ছাত্রজীবনেও আদর্শবাদ প্রবল না থাকে, তবে পরবর্তী জীবনে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তারা আদর্শবাদী রইবে এ কল্পনা আরো সুদূরপরাহত। প্রথম দৃষ্টিতে হয়তো মনে হতে পারে যে এ বিষচক্র ভাঙবার উপায় নেই। আদর্শচ্যুত সমাজে তরুণ সম্প্রদায়ও আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং যদি তরুণ বয়সেই আদর্শচ্যুতি ঘটে তবে পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসহীনতা, অনাচার ও সাংসারিক সংকীর্ণবুদ্ধি আরো প্রবল হতে বাধ্য কিন্তু কিশোর ও তরুণের প্রাণে আত্মদান ও আত্মোৎসর্গের যে প্রেরণা, বৃহত্তম আদর্শ ও সত্যের মধ্যে আত্মবিলোপের যে সাধনা, বিপদসঙ্কুল কঠিন পথে চলবার যে দুর্নিবার আকর্ষণ

সে কথা স্মরণ রাখলে এ বিষচক্র ছেদ করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। যুগ যুগান্ত মানুষের যে মহৎ সাধনা সহযোগের পথে মানুষকে নতুন নতুন বিজয়ের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে, নতুন নতুন সত্যের সন্ধানে মহামনা মানবের যে কঠিন ও বিরাট প্রয়াস, শিক্ষক যদি তরুণ সম্প্রদায়ের মনে তার আহ্বান সঞ্চারিত করতে পারেন, তবে তরুণ হৃদয় তাতে সাড়া দেবেই। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক যদি এ কথাও স্পষ্ট করে তুলতে পারেন যে সে সাধনার শেষ হয়নি, কোনদিন তার সমাপ্তি নেই, আজো অলব্ধ সত্য দুর্লভ গিরিশিখরে তরুণ তপস্বীর প্রতীক্ষায় রূপকথার রাজকন্যার মত মায়ানিদ্রায় আচ্ছন্ন, তবে অসাধ্য সাধনার সাধক তরুণ নতুন অভিযানে যাত্রা করবেই। শিক্ষকের মনে আগুন না থাকলে ছাত্রদের মনে আগুন জ্বালাবে কে? তাই সমস্ত শিক্ষা সংস্কারের গোড়ার কথা আদর্শবাদী এবং স্থিতপ্রজ্ঞ শিক্ষক। যেদিন নতুন ভারতবর্ষ এই নতুন যুগের উপযুক্ত শিক্ষক সম্প্রদায় গড়ে তুলবে, সেদিন শিক্ষাপ্রণালীর সমস্ত নিন্দা, অনুশাসনহীনতার সমস্ত অভিযোগ স্বভাবতই মিটে যাবে। শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই সাধক ও তপস্বীর আবির্ভাব আসন্ন, এই আশা আজ প্রত্যেক শিক্ষকের জীবনে নতুন আলো, নতুন উৎসাহ এনে দিক।